# ইউনিট ৩

## আধুনিক যুগে বাংলা (ইস্ট ইন্ডিয়া-ব্রিটিশ শাসনকাল ১৭৪৭-১৯৪৭)

## পাঠ-১: আধুনিক যুগের ধারণা

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কোম্পানি আমলে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইংরেজ আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- আধুনিক যুগে বাংলার সামাজিক আন্দোলন বর্ণনা করতে পারবেন।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের স্পর্শে কোনো সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি নির্মিত বা পরিচালিত হওয়ার সময়কে ইতিহাসে আধুনিক যুগ বলে ধরা হয়। এ সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সমাজে মানুষের মনোজগতে সাড়া ফেলে, সমাজ-অর্থনীতিতে শিল্প প্রযুক্তিকে উৎপাদনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজনীতি ও সরকার, সংবিধান বা আইনানুগ ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। এ সব উপাদান, লক্ষণ বা শর্ত যে সময় থেকে শুরু বা কার্যকর হয় সেই সময়কে একটি কাল বা যুগে চিহ্নিত করা হয়। ইতিহাসে এটিই হচ্ছে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই পৃথিবীর ইতিহাসে রেনেসাঁসের প্রভাবে রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে আধুনিক যুগের উদ্ভব ঘটেছে। তবে প্রতিটি দেশ ও জাতি নিজস্ব নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছে। যেমন, আমাদের দেশে রেনেসাঁসের জাগরণ তথা আধুনিক শিক্ষা ও রাজনীতির প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছে বলে দেখা যায়। তবে বাংলাসহ ভারতবর্ষ ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যন্ড়রে দীর্ঘ দুশ বছরের প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় নিয়ম-নীতির অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ব্রিটিশ শাসনের দুশ বছরে পুরাতন সামন্ড় , জমিদারি, সুবাদারি, নবাবি রাজ্য-শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে ক্রমে বঙ্গদেশে মনোনীত, পরে নির্বাচিত সংসদীয় ধারার সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক হলেও আধুনিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন, প্রশাসন ইংরেজ আমলে বাংলার প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থার মধ্যেই গড়ে উঠতে থাকে। এগুলোর উপর ভিত্তি করেই ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে।

### বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

১৭৫৭ সালের পর থেকে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ঔপনিবেশিক শাসনের যুগ শুরু হয়। তবে এই শাসন দুই পর্বে বিভক্ত ছিল। (১) প্রথম পর্ব-১৭৫৭-১৮৫৮ সালের ইস্ট-ইন্ডিয়ান কোম্পানির শাসন, (২) দ্বিতীয় পর্ব-১৮৫৮-১৯৪৭ সালের ব্রিটিশ সরকারের শাসন।

### ক. কোম্পানির শাসনকালে বাংলা(১৭৫৭-১৮৫৮)

ইস্ট-ইন্ডিয়ান কোম্পানির শত বছরের শাসনকালে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় নবাবি ব্যবস্থাপনাকে অকার্যকর করা হয়, একই সঙ্গে রাজস্ব শাসন ক্ষমতা (১৭৬৫ খ্রি.) ও বিচার বিষয়ক সংস্কারের (১৭৭২ খ্রি.) মাধ্যমে কোম্পানির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। ব্রিটিশ গভর্নর শাসনকে বাংলাদেশে দ্রুতই বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী করা হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত শাসন আইনে (১৭৮৬ খ্রি.) বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের হাতে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ন্যস্ড় করা হয়। এছাড়া ১৭৯৩ সালের জারিকৃত চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে বাংলায় ব্রিটিশ অনুগত একটি সংগঠিত জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও প্রশাসনে তাদের প্রতিষ্ঠার পথও সুগম করা হয়। মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজস্ব দপ্তর স্থানান্তর, দেওয়ানি ও সদর নিযামত আদালত প্রতিষ্ঠার ফলে যোগাযোগ সুবিধায় বেড়ে ওঠা নতুন ধাঁচের রাষ্ট্র কাঠামোর যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘদিনের সামন্ড় জমিদারি-নবাবি ব্যবস্থাকে দুর্বল করার মাধ্যমে কোম্পানির শাসনকে সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যেই এসব পরিবর্তন, স্থানান্ড়র, সংস্কার ও আইন প্রণয়ন করা হয়। তবে বাংলাকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজশক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার লক্ষ্যে ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট নামক যে আইন পাস করে তা মূলত সমগ্র ভারতের ওপর ব্রিটিশদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চিন্ড় থেকে করা হয়। এই আইন দ্বারা গভর্ণর জেনারেলের পদমর্যাদা, ক্ষমতা এবং সরকার ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হয়। এতে বাংলার গুরুত্ব সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এর ফলে ব্রিটিশ ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক দপ্তর, কাজকর্মের পরিসর বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রশাসনিক নগর হিসেবে কলকাতার উত্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৪-৮৫ খ্রি.), লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩ খ্রি.), লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রি.) প্রমুখ গভর্নর জেনারেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষে কাজ করেন। বাংলায় কোম্পানি শাসন একটি শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক

প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এর ফলে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি পদে অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর উত্থান ঘটে। সাধারণ মানুষ অবশ্য ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে প্রশাসন, বিচার বিভাগ, সামরিক ইত্যাদি অবকাঠামোর সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। এর ফলে অবশ্য শোষণ ও বৈষম্যের মাত্রা নতুনভাবে বৃদ্ধি পায়। এক সময় এসব বৈষম্য থেকে সৃষ্টি হয় ক্ষোভ ও বিদ্রোহ।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলায় বেশ কিছু বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল যেগুলোতে সাধারণ মানুষ অংশ গ্রহণ করেছিল। উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হচ্ছে ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন, নীলকর আন্দোলন, তিতুমীরের নেতৃত্বে আন্দোলন। তবে রাজনৈতিক শক্তির উত্থান না ঘটার ফলে এসব আন্দোলন শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে পরিচালিত করা যায়নি। কিন্তু এর প্রভাব পড়েছিল একমাত্র সংগঠিত শক্তি সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে যা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সূচনা করেছিল। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যারাকে সিপাহীরা বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে। এর ফলে বাংলাসহ ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্রিটিশ শাসনের ভিত প্রথম বারের মতো ব্যাপকভাবে কেঁপে ওঠে।

## খ. ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলা (১৮৫৮ পরবর্তী)

সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট ভারত শাসন আইন নামক একটি আইন পাস করা হয়। এই আইনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটানো হয়। ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজ্যের উপর ন্যস্ত করা হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারত বিষয়ক মন্ত্রকের হাতে এর শাসন ব্যবস্থার কার্যাদি হস্তান্তর করে। ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ভাইসরয় উপাধি নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী অভ্যুত্থান ঘটার প্রেক্ষিতে ভারতে সিভিল প্রশাসনের ভিত্তি মজবুত করার লক্ষে ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ড় সামরিক আইন, ভারতীয় পরিষদ (১৮৬১) ইত্যাদি প্রশাসনিক সংস্কারেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ভারতবর্ষে ১৭৭২ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর আওতায় চার সদস্য বিশিষ্ট গভর্নর জেনারেল অ্যান্ড কাউন্সিলকে ক্ষুদ্র পরিসরের আইনসভা বলা যেতে পারে। এতে যেকোন বিধি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাস করা হতো। ১৭৮৪ সালে অবশ্য গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধ করা হয়। ১৮৩৩ সালে উক্ত কাউন্সিলে একজন অতিরিক্ত আইন সদস্য রাখার বিধান করা হয়। দেশ শাসনে দেশবাসীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার দাবি জানিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষর করা দাবিনামা পাঠানো হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৬১ সালে ভারত সরকারকে বাংলায় প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর ফলে ১৮৬১ সালের ১আগস্ট ভারতীয় কাউন্সিল আইন ঘোষিত হয়। বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় আইনসভার কার্যক্রম শুরু হয়। এই আইনসভায় লেফটেনেন্ট গভর্নর পদাধিকার বলে সভাপতি, ১২ জন মনোনীত সদস্য, যার মধ্যে চারজন মাত্র বাঙালি ছিলেন, বাকি ৮ জনের ৪ জন সরকারি সদস্য, ৪ জন বেসরকারি সদস্য ছিলেন। ১৮৯২ সালে ১৩ জনের স্থলে এই সভার সদস্য ২১ জন করা হলো। তবে এই প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করার বিধান ছিল না। কিন্তু তারপরও বাংলার প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভাই বাংলাকে গণতান্ত্রিক আইনসভার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

অপরদিকে ১৮৫৩ সালেই চার্লস গ্রাণ্ট বাংলা প্রদেশকে দুই ভাগ করার প্রস্তাব দেন। বাংলাকে বিভক্ত করার উদ্যোগ ব্রিটিশ সরকারের মধ্যেই ছিল। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে বঙ্গদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি ছিল। বাংলাকে বিভক্ত করার চিন্ড়া থেকেই ১৯০৩ সালে ভারত সরকার বাংলার সীমানা নির্ধারণ করে। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর নতুন বিন্যাসে আসামের সঙ্গে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ছাড়াও দার্জিলিং বাদে জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঢাকায় রাজধানী করে 'পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ' নামে নতুন প্রদেশ ঘোষিত হয়। এ ছিল পূর্ববঙ্গের আলাদা প্রাদেশিক পরিচয়ে বেড়ে ওঠার ইতিহাস।

## ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশ

১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্ড়গত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ১৭৬৫ সালের পর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করার পর বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে পণ্য প্রেরণ অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। কোম্পানি শাসনের পুরো সময় জুড়ে বাংলার অর্থনীতিতে সমৃদ্ধির কোনো পরিকল্পনা কোম্পানির ছিলনা। অথচ বাংলা ছিল অর্থনৈতিকভাবে ভারতবর্ষের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। কোম্পানির বিমাতাসুলভ আচরণের কারণেই ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালে সমগ্র বাংলায় মহাদুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এতে ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করে তিনভাগের একভাগ অধিবাসী। বাংলার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে, গ্রামবাংলা জনশূন্য হয়ে পড়ে। এতোবড় দুর্ভিক্ষ বাংলা আর কখনো দেখেনি। শুধু কৃষি নয়, শিল্পখাতেও কোম্পানির 'রক্তচোষা নীতি' অনুসৃত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের কুটির শিল্প, তাঁত, বস্ত্র শিল্প ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ে নেমে যায়। কোম্পানির শত বছরের শাসনামলে বাংলার অর্থনীতি ছিল স্থবির, নির্মম শোষণ-নির্ভর। অর্থনীতির পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল কোম্পানি শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ শাসন (১৮৫৭) প্রতিষ্ঠার পর থেকে। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর জমির ওপর কৃষকের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয় ১৮৫৭ সালের রাজস্ব আইন ও ১৮৮৫ সালের ভূমিস্বত্ব আইনে। তবে কোম্পানির আমল থেকে নিজেদের কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধার্থে কিছু শিল্প-পুঁজির বিনিয়োগ শুরু হয়। যেমন ১৮৫৪ সালে বোম্বাই (মুম্বাই) ও কলকাতার মধ্যে সরকারি

উদ্যোগে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ যে উদ্দেশ্যেই ঘটুক না কেন তা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন, সরবরাহকে দ্রুততর ও সহজতর করেছে। এতে যান্ত্রিক ও শিল্প স্থাপনার প্রসার ঘটেছে, আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতি পরাধীনতার চরিত্র নিয়ে হলেও যাত্রা শুরু করেছে। ব্রিটিশ রাজশক্তি বাংলাকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বরং ব্রিটিশ ভারতের অংশ হিসেবেই এর কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য ইত্যাদিকে ব্যবহার করেছে। এতে বড় অংকের ব্রিটিশ পুঁজি সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান, যানবাহন, কৃষি ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ হয়। বিশ্ববাজারে তখন চা, পাট, নীল, বস্ত্র, তুলার চাহিদা ছিল। বাংলাদেশ এসব পণ্য উৎপাদনে মধ্যযুগ থেকেই খ্যাতি অর্জন করেছিল। ব্রিটিশ শাসন এসব খাতে নিজেদের স্বার্থেই কারখানা স্থাপন করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। তবে ব্রিটিশ আমলে রেলওয়ে যোগাযোগ খাতে বিপ্লব সাধিত হলেও কুটির শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকার বৃহৎ পুঁজি ও প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত বেশি মুনাফার স্বার্থে বিবেচনা করেছিল। অথচ বাংলায় প্রয়োজন ছিল অর্থনীতিতে ছোট পুঁজির বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারকে বেগবান করা। এর ফলে ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্বনির্ভর পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধারা বিকশিত হতে পারে নি। বাংলাদেশ এ কারণে কৃষিজ অর্থনীতিকে শিল্পবিকাশে কাজে লাগাতে পারেনি। শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে বেড়ে ওঠা আধুনিক যুগে বাংলার অর্থনীতি আধুনিক পুঁজির বিকাশ থেকে বঞ্চিত হয়ে পরবর্তীকালে একটি পরনির্ভরশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে থেকে গেছে।

## ইংরেজ আমলে বাংলার সামাজিক অবস্থা

কোম্পানি শাসনের শুরু থেকে ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত বাংলার সমাজব্যবস্থা মূলত সামন্ততান্ত্রিক ছিল। তবে ব্রিটিশ যুগে পুঁজিবাদের প্রাথমিক সম্পর্কসহ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। সে কারণে বাংলার সমাজে একদিকে কৃষক, অন্যদিকে জমিদার শ্রেণী সামন্তসমাজের দুই পরস্পর বিরোধী শ্রেণী অবস্থান করেছিল। সমাজে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। বণিক শ্রেণীটি তেমন সবল ছিল না, শিল্পে বাঙালির উত্থানও তেমন ছিল না। তবে সমাজের আমলা, উকিল, শিক্ষকসহ বেশ কিছু পেশার সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের একাংশ যুক্ত হয়। সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য ছিল ব্যাপক। নারীর অধিকার স্বীকৃত ছিল না। দরিদ্র কৃষক ও কুটির শিল্পে নারীর শ্রম লক্ষণীয় ছিল।

বাংলাদেশ সমাজে মুষ্টিমেয় কিছু উপজাতি ছাড়া বাকি সবাই জাতিগতভাবে বাঙালি। ব্রিটিশ যুগে খ্রিস্ট ধর্ম বাঙালি সমাজে কিছুটা স্থান করে নেয়। ফলে ধর্মীয় পরিচয়ে বাঙালিকে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান এই চারটি শীর্ষস্থানীয় ধর্মে বিভক্ত করা যায়। জৈন, শিখ ধর্ম ছাড়াও মধ্যযুগীয় সুফিবাদ, পীর-মুরশীদের প্রভাব বাংলার সমাজে আধুনিক যুগেও একটি স্থান দখল করে ছিল। বাউল ও বৈষ্ণব জীবনাচরণের মানুষের সংখ্যাও একেবারে কম ছিল না।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের পাহাড় ও সমতলে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ বেশ কিছু উপজাতির বসবাস যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। একই অবস্থা উত্তরে সাঁওতাল, রাজবংশী, গারো, মনিপুরী, খাসিয়াসহ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বসবাস উলে- খ করার মতো। উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য অব্যাহত আছে। এসব জাতিগোষ্ঠীর জীবন ও সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ছোঁয়া আধুনিক যুগেও তেমনভাবে পড়েনি।

ঔপনিবেশিক যুগে ইংরেজ শাসনের ফলে বাংলাদেশের সমাজে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আধুনিকতার প্রভাব কার্যকরভাবে পড়েছে। উনিশ শতকে আধুনিক শিক্ষা বাঙালি নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটায়। অপরদিকে ব্রিটিশ বৈষম্য ও শোষণমূলক নীতির ফলে বাংলাদেশের সমাজে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনার উত্থান ঘটে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আন্দোলন, সংগঠন, সংস্থা গড়ে উঠেছে, ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করেছে।

## শিক্ষা ব্যবস্থা

১৮১৩ সাল পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানি সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ে তেমন কোনো প্রকার সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। ততদিন পর্যন্ড় বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানদের শিক্ষা ছিল আলাদা। হিন্দুরা ব্যাকরণ, পৌরাণিক সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র পড়তো। 'টোল' ও 'চতুষ্পাঠী' ছিল তাদের শিক্ষা কেন্দ্র। মুসলমানদের শিক্ষা বলতে পবিত্র কোরান, হাদিস, ইসলামী নিয়ম-কানুন শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মূলত 'মক্তব' ও 'মাদ্রাসা'ই ছিল তাদের শিক্ষাকেন্দ্র। লর্ড হেস্টিংস অবশ্য মুসলমানদের অনুরোধে ১৭৮১ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে ইংরেজ রেসিডেন্ট জোনাথন ১৭৯১ সালে বারানসীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোনস কলিকাতায় প্রাচ্যের ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে ব্রিটিশ কর্মচারীদের প্রাচ্য ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ সালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন চারদিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পাশ্চাত্য ভাষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি থেকেই বাংলায় বেসরকারি উদ্যোগে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুর" হয়। ১৮৩৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত সরকারের ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের কোনো পরিকল্পনা লক্ষ করা যায় না।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেকলের সুপারিশ মোতাবেক উইলিয়াম বেন্টিক ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের সরকারি নীতি ঘোষণা করেন। মেকলের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি ভারতীয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করা যারা রঙে ভারতীয় হলেও চিন্তায় হবেন ব্রিটিশ। তার এই চিন্তা আংশিক সফল হলেও ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে বাংলা তথা ভারতবর্ষের পরাধীন

মানুষ আধুনিক বিশ্বচিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে, একই সঙ্গে এই ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের একটি অংশই দেশের স্বাধীনতার জন্য মানুষের উদ্বুদ্ধ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবচিন্তা, চেতনা ও কর্মকান্ডকে নবজাগরণ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এটি বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটায়। রাজা রামমোহন রায়কে (১৭৭২-১৮৩৩) এই আন্দোলনের পুরোধা বলা হয়ে থাকে। তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনি, আন্দোলন করা, সচেতনতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি উপায়ে কাজ করেন। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেরনি ডিরোজিও (১৮০৭-৩১) মুক্ত চিন্তার একজন অগ্রনায়ক ছিলেন। শ্রেণীকক্ষের বাইরেও সাহিত্য সভা, বিতর্ক সভার মাধ্যমে তিনি ছাত্রদের মুক্তচিন্তা চর্চায় উৎসাহিত করতেন। সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে নবজাগরণের এই ধারায় বাঙালি মুসলিম সমাজ তেমন যুক্ত হয়নি। বাঙালি মুসলমান সমাজ তখনো আধুনিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি। তবে হাজি মুহম্মদ মহসীন (১৭৩০-১৮১২) পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষার প্রসারে তার সম্পত্তি দান করে যান। উক্ত অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলিম ছাত্রদের আর্থিক সহযোগিতা দান করার ব্যবস্থা ইংরেজরা করে গেছেন। এছাড়া নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) এবং সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮ খ্রি.) নিজস্ব অবস্থান থেকে বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের ধারায় যুক্ত করেন।

নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে মোহামেডান সাহিত্য পরিষদ গঠন করেন। এতে নিয়মিত বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। এতে আধুনিক শিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সীমিত আকারে হলেও উপলব্ধির সুযোগ ঘটে। সৈয়দ আমীর আলী যে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন তা এখনও অত্যন্ত বহুল পঠিত ও প্রশংসিত গ্রন্থ। সীমিত আকারে হলেও বাংলার মুসলিম সমাজ নবজাগরণের আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। বাংলার অন্যান্য ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়সমূহ আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় যুক্ত হয়নি। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তের উচ্চশিক্ষার দ্বার কিছুটা হলেও খুলে দেয়। আধুনিক শিক্ষা, নবজাগরণ, বাংলা সাহিত্যের বিকাশ বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল গঠন, আন্দোলন সংগ্রামের সূচনায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

## আধুনিক যুগে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে এখানকার সমাজ পাশ্চাত্যের জীবন, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সংস্কৃতিসহ অনেক কিছুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে থাকে বাংলাদেশের সমাজ জীবনেও। এমনিতেই আমাদের সমাজ নানা কুসংস্কার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসে পিছিয়ে পড়েছিল। ইংরেজ শাসন ও শোষণে মানুষ নিষ্পেষিত হয়েছে, দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করেছে সত্য, কিন্তু উনিশ শতকের শুরু থেকেই এখানে নিজের স্থবির সমাজকে জাগিয়ে তোলা কুসংস্কারকে দূর করা, শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হওয়া, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। নতুন জাগরণে উজ্জীবিত অনেক বাঙালি এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আমরা তেমন কয়েকজনের জীবন ও কর্মের সঙ্গে পরিচিত হবো।

**রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ঃ** ভারতের 'প্রথম আধুনিক মানুষ' বলে খ্যাত এই মানুষটির অন্তর এ দেশের মানুষের জন্য আল্লত ছিল। তিনি আমাদের সমাজের কুসংস্কার, জড়ত্ব, দুর্নীতি ইত্যাদি দেখে ব্যথিত ছিলেন। পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করার কথা তাই তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন।

রামমোহন ১৭৭২ সালে হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা মুঘল কর্মচারী ছিলেন। তিনি আরবি ও ফার্সি ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। ১৮০৩ সালে তিনি আরবি ও ফার্সি ভাষায় রচনা করেন 'তুফাত-উল-মোয়াহিদ্দীন' নামক একটি গ্রন্থ। তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে এ বিশ্বাসে উপনীত হন যে, একেশ্বরবাদই হলো ধর্মের মূলকথা। তিনি বর্ণভেদ-প্রথা ও অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের নিন্দা করেন। ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ নামে একটি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এতে বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসঙ্গীতের আসর বসত। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অনেক মানুষই ব্রাহ্মসভার উপাসনায় যোগ দিত। অবশ্য ১৮১৫ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে রামমোহন রায় যুবকদের জন্য 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর এসব সংস্থা ও ধর্মীয় কর্মকান্ডের পেছনে কোনো গোঁড়ামি কাজ করেনি। বরং এসব থেকে যুবকদের, ধর্মান্ধ মানুষদের মুক্ত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

রামহোমন রবাবরই সমাজের কুসংস্করের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ১৮১৮ সালে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় বিধবা স্ত্রীর সহমরণের বিরুদ্ধে তিনি জনমত গড়ে তোলেন। তিনি তরুণদেরকে এ আন্দোলনে যুক্ত করেন। তাঁর আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। ১৮২৯ সালে এক আইন বলে বেন্টিঙ্ক এ পাশবিক প্রথা নিষিদ্ধ করেন। গোঁড়া ও উগ্র হিন্দুরা এর বিরোধিতা করলেও রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর সমর্থকদের বিপুল সমর্থনে এই আইন ভারতীয় সমাজে দ্রুত বাস্তবায়িত হতে থাকে। তিনি বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধেও তীব্র আন্দোলন গড়ে

তেলেন। তিনি নারী শিক্ষা, সম্পত্তিতে নারীদের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও সোচ্চার ছিলেন। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার প্রসারে তিনি গভীরভাবে কাজ করেন। তিনি ১৮২২ সালে কলকাতায় এ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া পত্রপত্রিকা প্রকাশেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। ১৮৩০ সালে তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৩৩ সালে তিনি ইংল্যান্ডে মৃত্যুবরণ করেন।

**হাজী শরিয়ত উল্লাহ (১৮৪০ মৃত্যু) ঃ** ফরায়েজী আন্দোলনের পথিকৃত হচ্ছেন হাজী শরিয়ত উল্লাহ। শরিয়তপুরে জন্মগ্রহণ করলেও হুগলি ও মক্কায় তার জীবনের অনেক বছর অতিবাহিত হয়। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মদ মুহসীন উদ্দিন দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) ফরায়েজী আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। তবে তিনি তাঁর পিতার চিন্তাধারাকে শুধুমাত্র ধর্মীয় বলয়ে আবদ্ধ রাখেননি, বরং তিনি জমিদার, নীলকর, সুদখোর মহাজনদের শোষণসহ বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষের মুক্তির আন্দোলনে সক্রিয় হন। তার আন্দোলন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। তিনি তার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য বাংলাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতিটি অঞ্চলকে একজন করে খলিফার ওপর ন্যস্ত করেন। খলিফারা জমিজমাসহ বিভিন্ন ধরনের বিরোধের নিষ্পত্তিও করতেন। তাঁর বিচার পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয় ছিল। তিনি জমিদারদের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। জমিদারদের বিরুদ্ধে তিনি সরকারের আদালতেও মামলা করেন। অত্যাচারী জমিদার এবং নীলকরদের তিনি আতঙ্ক ছিলেন। তবে তাঁর মৃত্যুর পর (১৮৬২) ফরায়েজী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

**ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ঃ** উনিশ শতকের অন্যতম প্রধান পন্ডিত ও সংস্কারক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃতের পন্ডিত হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর ছিলেন পাশ্চাত্য চিন্তা ও শিক্ষার একজন উদারবাদী সমর্থক। তৎকালীন সমাজে হিন্দু বিধবাদের অসহনীয় জীবন তাকে পীড়িত করতো, তিনি তাদের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত ছিলেন। তিনি অবহেলিত বিধবাদের মুক্তির জন্য সমগ্র জীবন সংগ্রাম করেন। বিধবা-বিবাহের সপক্ষে জনমত গঠন, আন্দোলন সংগঠিত করা ও যুক্তি উপস্থাপন করে বিদ্যাসাগর বাঙালি হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে প্রবলন আলোড়নের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। গোঁড়াপন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থা গ্রহণ করে তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা করেছিল। তারপরও তিনি বিধবা-বিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। ১৮৫৬ সালে অবশেষে বিধবা-বিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। ১৮৫৬ সালে অবশেষে বিধবা-বিবাহ আইন পাস হয়। বিদ্যাসাগর একইভাবে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। দেশে নারী শিক্ষার বিস্ড়রে তিনি তাঁর চেষ্টা চালিয়ে যান।

বস্তুত বিদ্যাসাগর জনশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে 'বর্ণ পরিচয়' ১ম ও ২য় ভাগ, 'বোধোদয়', 'কথামালা' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করে বাংলা ভাষায় শিক্ষার পথ রচনা করেন।

**হাজী মুহম্মদ মহসীন (১৭৩০-১৮১২) ঃ** মুসলমান বাঙালি সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে অমর হয়ে আছেন হাজী মুহম্মদ মহসীন। তিনি হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিকভাবে প্রাপ্ত প্রচুর ধন সম্পত্তির বিরাট অংশই তিনি জনগণের শিক্ষা বিস্তার এবং কল্যাণে উৎসর্গ করে যান। তিনি নিজে হুগলিতে একটি ইমামবারা স্থাপন করেন। এটি একটি দর্শনীয় স্থানরূপে খ্যাতি লাভ করেছে। তিনি মৃত্যুর আগেই তাঁর সম্পত্তি ধর্মকাজ ও জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্য একটি ট্রাস্টের ওপর ন্যস্ত করে যান। তাঁর অর্থে হুগলি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, যশোরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া দুস্থদের সেবায় তিনি নিজে যেমন অর্থ ব্যয় করেছেন, তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত বোর্ডও তা করে থাকে। সে কারণেই হাজী মুহম্মদ মহসীনকে দানবীর বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের পাশ্চাৎপদ সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষায় আলোকিত করা, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা, সামাজিক অন্যায়-অবিচার, অমানবিক, বৈষম্যমূলক প্রথার বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীতে যারা অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তারা আসলেই একটি বৈপ- বিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সমাজ সংস্কারের এই আন্দোলনে আরো অনেকেই যুক্ত ছিলেন, অবদান রেখেছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁরা সকলেই স্মরণীয় হয়ে আছেন।

**পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১**

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ**

১. কোম্পানি যুগে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতির অবস্থার বর্ণনা দিন।
২. ইংরেজ আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল?
৩. রাজা রামমোহন রায়ের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করুন।

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. কোম্পানি আমলে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দাও।
২. উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বর্ণনা দাও।

৩. ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা।
৪. আধুনিক যুগে বাংলার সামাজিক আন্দোলনের বর্ণনা দাও।

# পাঠ-২: বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯০৫-১৯১১)

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্বদেশী আন্দোলন বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুসলিমলীগের প্রতিষ্ঠা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বিশ শতকের শুরুতে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড কার্জনের 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের ঘোষণা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম আলোচিত ও সমালোচিত ঘটনা। এটিকে 'বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা মুহূর্তের মধ্যে শুধু বাংলার হিন্দু মুসলিম দুই বৃহৎ সম্প্রদায়কেই মানসিক ও ভূখন্ডগতভাবে বিভক্ত করেনি, সমগ্র উপমহাদেশকেই দ্বিজাতিতত্ত্বে পরবর্তীকালে বিভক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৫ সালে 'পূর্বভঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের ঘোষণা দিয়েছিল তারাই আবার ১৯১১ সালে তা রদ বা বাতিলের ঘোষণা দেয়। বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণায় বাংলা সাময়িকভাবে ভূখন্ডগতভাবে আবার একত্রিত হলেও সেই ঐক্য স্থায়ী হয়নি। বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হওয়ার পর বাঙালি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলাকে কেন্দ্র করে যে বিভেদের রাজনীতি সূচিত হয়েছিল তা ১৯৪০ সাল থেকে প্রকট আকার ধারণ করে এবং ১৯৪৭ সালে বাংলার ভূখন্ড ভারত ও পাকিস্ড়ানের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। বঙ্গভঙ্গের ঘোষিত প্রদেশের অংশ বিশেষ পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হলেও পূর্বভঙ্গ খ্যাত উক্ত অংশ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচয়ে বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটায়।

## বঙ্গভঙ্গের পটভূমি

ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যে বাংলার অবস্থান সব সময়ই ব্যতিক্রমধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে কারণে বাংলাকে নিয়ে ব্রিটিশ শাসক মহলে সব সময়ই ভয় ও আতঙ্ক কাজ করতো। এই আতঙ্ক থেকেই সরকারের মধ্যে বাংলাকে 'বিভাজন নীতিতে' শাসন (Divide and Rule) করার চিন্তাভাবনা লক্ষ করা যায়। তাদের এই পরিকল্পনা উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে। বাংলাকে বিভক্ত করার অজুহাত হিসেবে ইংরেজ শাসকরা এর আয়তনকে বড় বলে প্রচার করে এবং শাসন কার্যের সুবিধার্থে এই বিভাজন হওয়া দরকার বলে বলা হয়। ১৮৫৩ সালে চালর্স গ্রান্ট বাংলা প্রদেশকে দুভাবে ভাগ করার প্রথম প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্ড়াব তৎকালীন ইংরেজ কোম্পানির ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী শাসক (গভর্নর) বলে খ্যাত লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-৫৬ খ্রি.) ১৮৫৪ সালে সমর্থন করেন। ১৮৬৬ সালে ভারত সচিব লর্ড নর্থকোট উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন তাতেও বাংলা নামক প্রদেশকে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। ১৮৭৪ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে আসামকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। বাংলা ভাষাভাষী শ্রীহট্ট (সিলেট), কাছাড়, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি জেলা আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এটিই হচ্ছে বঙ্গভঙ্গের প্রথম পদক্ষেপ। আসামের চিফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড ১৮৯৮ সালে উক্ত আসামের সঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। এই সময়ে ব্রিটিশ ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করে মধ্য প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেন মধ্যপ্রদেশের সহকারী গভর্নর অ্যান্ড্রু ফ্রেজার। তখন সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং আসামের কিছু অংশ নিয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সি কার্যকর ছিল। সমগ্র এই প্রশাসনিক অঞ্চলকে বাংলার বঙ্গদেশও বলা হতো। লর্ড কার্জন ফ্রেজারকে বিষয়টি নিয়ে আরো সক্রিয়ভাবে চিন্তাভাবনা করার জন্য মধ্যপ্রদেশ থেকে বাংলার গভর্নর পদে নিযুক্তি দেন। তখন থেকে কার্জন ও ফ্রেজার বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের জন্য একত্রিত হয়ে কাজ করেন। ১৯০৩ সালে ভঙ্গভঙ্গের প্রস্ড়াব সরকারিভাবে উপস্থাপন করা হয়। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলির স্বাক্ষরে তৎকালীন বাংলা সরকারের কাছে চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রস্ড়াব করা হয়। রিজলি প্রস্তাব নামে পরিচিত উক্ত প্রস্ড়াবের খবর জানাজানি হলে হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণও এর বিরোধিতা করে প্রতিবাদ জানায়। পূর্ববাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সভাসমাবেশ থেকে প্রতবাদ জানানো হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকার এবার তাদের পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে পিছপা হয়নি। বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা, প্রতিশ্রুতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি এ ধরনের সিদ্ধান্তকে ঘিরে প্রচারিত হতে থাকে।

## বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা

১৯০৫ সালের ২০ জুলাই সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু ঘোষণায় মালদহ জেলা, আসাম, ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা ও রাজশাহী বিভাগকে একত্রিত করে 'পূর্বভঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ করার সিদ্ধান্ড় জানানো হয়। এর আয়তন ছিল ১,৬৫,৬৪০ বর্গমাইল এবং তখন এখানে জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটির বেশী। উক্ত ঘোষণায় নতুন প্রদেশের শাসনভার একজন লেফটেনেন্ট গভর্নর (সহকারী গভর্নর)-এর ওপর ন্যস্ড় করা হবে, ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হবে, প্রদেশটি কলিকাতা হাইকোর্টের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ, কুচবিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে গঠিত হবে বাংলার আর একটি আলাদা প্রদেশ। নতুনভাবে গঠিত এই বাংলা

প্রদেশের রাজধানী কলিকাতা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ'-এর লেফটেনেন্ট গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

### বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার বিরুদ্ধে বঙ্গপ্রদেশের সর্বত্রই তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ১৯০৪ সাল থেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৪ সালের ১৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম প্যারেড ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদসভা, ৫ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারকে দেওয়া প্রতিবাদলিপি তার অন্যতম উদাহরণ। তবে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর দিবসে বাংলার অখন্ডতা ঘোষণা করে নানা কর্মসূচি, ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করে সমাজের সর্বস্তরর মানুষ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্ড়াব অনুসারে ঐ দিন 'অরুদ্ধন' অর্থাৎ ভূখা কর্মসূচি পালিত হয় সর্বত্র। পূর্ব থেকেই দিনটিকে 'শোকদিবস' ঘোষণা করা থাকায় দিনটি সর্বত্র ধর্মঘট বা হরতাল হিসেবে পালিত হয়। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার আগেই 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ১৯০৫ সালের ১৩ জুলাই সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক 'বয়কট' আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ অনেকেই ১৯০৫ সালের ১৭ জুলাই বাগেরহাট অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভা থেকে ইংরেজদের 'বয়কট' করার আহ্বান জানান। এই বয়কটের মধ্যে ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রী এবং জাতীয় আনন্দ-উৎসব বন্ধ রাখার আহ্বান জানানো হয়। এর ধারাবাহিকতা স্বরূপ অশ্বিনীকুমার 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায় এক আবেদন জানিয়ে বিলেতি দ্রব্য বর্জনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার আহ্বান জানান। ২১ জুলাই (১৯০৫) দিনাজপুরের মহারাজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভা থেকে জেলা বোর্ড, পৌরসভা ও পঞ্চায়েত থেকে সকল সদস্যকে পদত্যাগ করা এবং পরবর্তী এক বছর 'জাতীয় শোক' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কলকাতার রিপন কলেজের ছাত্র সমাজ ১৯০৫ সালের ১৭ ও ১৮ জুলাই 'বয়কট'কে পবিত্র আদর্শ হিসেবে গ্রহণের শপথ গ্রহণ করে। ৩১ তারিখ কলকাতার সবকটি কলেজের ছাত্ররা মিলিত হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং কেন্দ্রীয় সংগ্রাম সমিতি গঠন করে। ঐ বছর ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে বিভিন্ন স্ড়রের মানুষের এক বিরাট প্রতিনিধিত্বমূলক সভা থেকে 'সংযুক্ত বাংলার' পক্ষে স্লে-াগান ধ্বনিত হয়। সেদিন কলকাতা শহরে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ দোকানপাট বন্ধ ছিল। দেশের অনেক স্থানেই বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

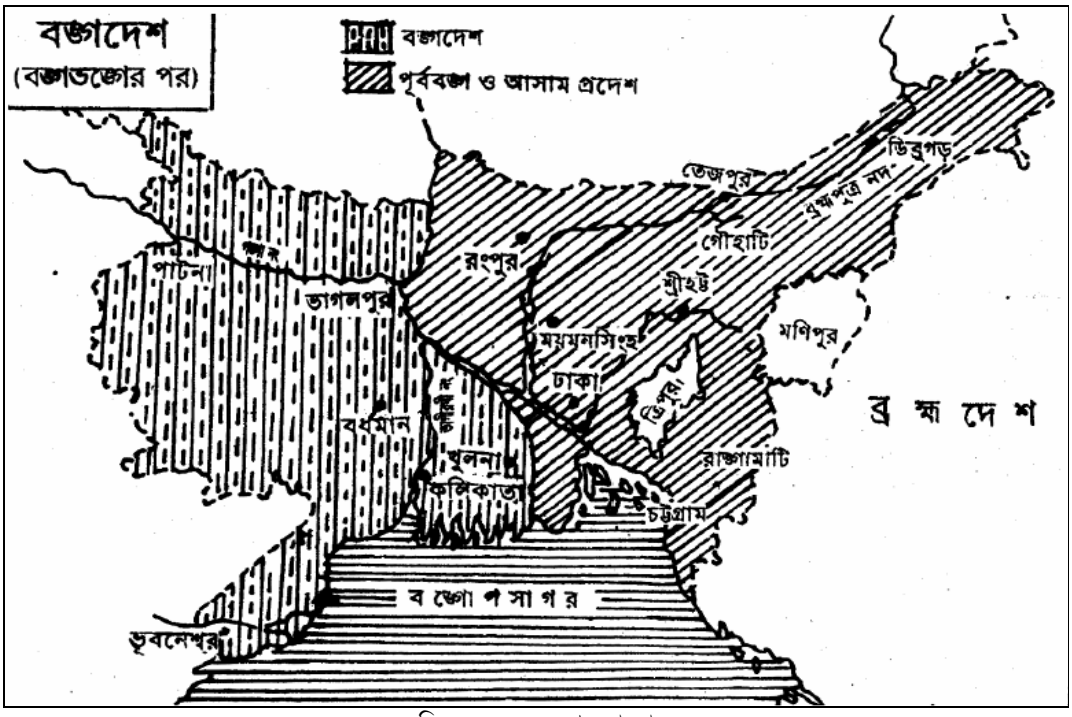


চিত্র ঃ বঙ্গভঙ্গের পর বাংলা

১৬ অক্টোবরের বেশ আগেই বিলেতি পণ্যসামগ্রী বর্জনের কর্মসূচি সর্বস্ড়রে ব্যাপক প্রভাব বিস্ড়ার করে। আন্দোলনটি এতোই জনপ্রিয়তা পেতে থাকে যে, বাংলায় ইংরেজদের সামাজিকভাবেও বয়কট করা হতে থাকে। বাঙালিরা তাদেরকে দোকানপাটে কেনাবেচা থেকে সেবার সকল খাতেই এড়িয়ে চলতে থাকে। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ দিবসে কলকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রামসহ অনেক স্থানেই আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদের কর্মসূচিতে মানুষ অংশ গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি জাতির ঐক্যকামনা করে হিন্দু-মুসলমানের অংশ গ্রহণে 'রাখী বন্ধন' পালনের আহ্বান জানান। সেই কর্মসূচি পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বন্দে মাতরম...' গান গীত হয়। তিনি রচনা করেন "বাংলার মাটি, বাংলার জল...." শীর্ষক প্রবল দেশপ্রেমের আবেগাপ-ুত গানটি।

পত্রপত্রিকাগুলো বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতার ভূমিকা পালন করে। 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে 'এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়' বলে মত রাখা হয়। 'হিতবাদী' পত্রিকায় 'বাঙালি জাতির দুর্দিন' বলে অভিহিত করা হয়। 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের উদ্যোগকে 'বাঙালি জাতিকে ধ্বংস' করার পরিকল্পনা বলে উল্লেখ করে। এমনকি `Daily News' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে 'অদূরদর্শী রাজনৈতিক জ্ঞানে পরিচায়ক' বলে মন্তব্য করা হয়। এ ছাড়াও 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'ইংলিশম্যান', 'পাইওনিয়ার', 'স্টেটম্যান'সহ বিভিন্ন পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের সরকারি উদ্যোগকে নিন্দা জানিয়ে লেখালেখি করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, পাঞ্জাবসহ ভারতের আরো অনেক স্থানে।

## সরকারের ভূমিকা

ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে তাদের রাজত্বের জন্য বিপজ্জনক মনে করেই বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার কথা জানাজানি হওয়ার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে ব্রিটিশ সরকার বাঙালি জাতির মধ্যে তাদের 'বিভাজন নীতি' (Divide and Rule Policy) প্রয়োগ করে। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সমর্থন পাওয়ার জন্য লর্ড কার্জন পূর্ব বাংলায় ১৯০৪ সালে ব্যাপক সফর করেন। তিনি চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ সফর করেন। এসব জায়গায় বক্তৃতাকালে তিনি মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করলে 'পূর্ববঙ্গে এমন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে যা অতীত মুসলমান আমলেও' গড়ে উঠেনি বলে মন্তব্য করেন। লর্ড কার্জন এবং ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তাই তারা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পক্ষে খোলাখুলি প্রচারণা চালান। আসলে এর ফলে বৃহত্তর প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও বিভক্তি ও অনেকটা ছড়ানো সম্ভব হয়েছিল।

## বাঙালি মুসলমানদের ভূমিকা

বঙ্গভঙ্গের ঘোষণার প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সকল কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম ১৯০৪ সালের ১৭ জানুয়ারি প্যারেড ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন চৌধুরী আনোয়ার আলী খান। এই আন্দোলনে মৌলভী আমীর আলী, মৌলভী ওবায়দুর রহমান খান, মৌলভী রিয়াজউদ্দিন আহমদ, কাজেম আলী মাস্টার, মৌলানা একরামুল হক যুক্ত ছিলেন। জাতীয়ভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবদুর রসুল, লিয়াকত হোসেন, আদুল হালিম গজনভি, মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী প্রমুখ। ১৯০৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার রাজাবাজারের মুসলমানদের এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আবদুর রসুল। দেশের সর্বত্রই বঙ্গভঙ্গের বিপদ সম্পর্কে অগ্রসর মুসলমানদের মধ্যে আশঙ্কা বিরাজ করছিল। সে কারণে তারা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে ইংরেজদের প্ররোচনা, নেতৃত্বের অভাব, এলিট মুসলিম নেতাদের ইংরেজ আনুকুল্য গ্রহণ ইত্যাদি কারণে বৃহত্তর মুসলমানদের মধ্যে মিশ্র অনুভূতি ছিল। এছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে মুসলমানদের যুক্ত করার উদ্যোগের অভাবের কারণে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে, এ থেকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস দানা বাঁধে, ক্রমেই হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। এ থেকে ১৯০৭ সালের দাঙ্গা ইত্যাদি কারণে বাঙালির জাতিগত ঐক্য অনেকটাই ভেঙ্গে দিতে ব্রিটিশ সরকার সফল হয়েছিল।

## এলিট বনাম সাধারণ হিন্দু-মুসলিম স্বার্থ

বঙ্গভঙ্গের বিষয়টি বাঙালি অভিজাত (জমিদার, উকিল, ধনিক-বণিক ও আমলা) শ্রেণী নিজ নিজ স্বার্থ ও সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে দেখেছে। বাঙালি মুসলমানদের বড় অংশই যেহেতু শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া ছিল তাই তারা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজের চেয়ে প্রতিবেশী হিন্দু অভিজাতদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বেশি বিবেচনা করতে শুরু করেছে। সুতরাং তারা ভঙ্গভঙ্গকে মনেপ্রাণে সমর্থন করতে থাকে। অপরদিকে অভিজাত হিন্দুরা তাদের সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় বেশি যোগদান করেছিল। এক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাত গোষ্ঠী ভঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বাঙালি হিন্দুদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের কোনো কোনো কর্মসূচিতে ধর্মীয় বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে সংযত রাখা হয়নি। ফলে মুসলমানদের এগুলোতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সমস্যা ছিল। প্রশাসনিক পর্যায়ে মুসলিম এলিটরা প্রতিবাদী হওয়ার হতো মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। বাঙালি সাধারণ মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত করার মতো পর্যাপ্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দ ছিলেন না। তবে যারা যুক্ত ছিলেন তারা সকলেই শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রসর ছিলেন। বাঙালি নবাব, জমিদার তথা এলিট অংশ তখন মসুলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে রাজনীতিতে পৃথক একটি ধারা তৈরিতে অধিক মনোযোগী ছিলেন। ফলে উপর শ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দ্বটিকে হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব হিসেবে বঙ্গভঙ্গে অত্যন্ড় সূক্ষ্মভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছিল যা সাধারণ বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ধরতে পারেনি, বুঝতে পারেনি।

## ব্রিটিশদের দমন নীতি

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু থেকেই ব্যাপক প্রভাব বিস্ড়ার করতে সক্ষম হয়। বিশেষত উঠতি মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি হিসেবে তরুণ ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে এই আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ তরুণ ও ছাত্রসমাজ 'স্বদেশী আন্দোলন' ও 'বয়কট' আন্দোলনে অত্যন্ড় নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই প্রথম বাংলার তরুণ ও ছাত্রসমাজ ব্রিটিশবিরোধী একটি জঙ্গি, প্রতিরোধমূলক মনোবৃত্তির আন্দোলনে যুক্ত হয়। দেশকে ভালবাসা, আন্দোলনের মাধ্যমে শাসকদের চেনা ও জানার এটিই ছিল প্রথম প্রত্যক্ষ সুযোগ। এতে ব্রিটিশ সরকার ভীত হয়ে পড়ে। সরকার ছাত্রদেরকে আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ১৯০৫ সালের ১০ অক্টোবর একটি প্রজ্ঞাপন (সার্কুলার) জারি করে। এতে

ছাত্রদের রাজনৈতিক সমাবেশ, পিকেটিং মিছিল ইত্যাদির ওপর বিধি নিষেধ জারি করা হয়। এর প্রতিবাদে যুবসমাজ (প্রজ্ঞাপন বিরোধী সমাজ) তৈরি করে। উক্ত সমাজ থেকে দন্ডাদেশ প্রাপ্ত ছাত্রদের শিক্ষাদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলে দেখা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অভ্যন্তরীণ নানা সীমাবদ্ধতা, দ্বিধা, বিভক্তির পরও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি, সরকারের গৃহীত দমন-নিপীড়নের বিপরীতে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এর সাংগঠনিক রূপ গ্রহণ করে একদিকে 'স্বদেশী আন্দোলন', অন্যদিকে মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে।

### স্বদেশী আন্দোলন

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে স্বদেশী ভাবধারা, বিদেশী পণ্য বর্জন, 'বয়কট' ইত্যাদি পন্থায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী যে আন্দোলন বাংলায় গড়ে উঠেছিল তাকেই স্বদেশী আন্দোলন বলা হয়। এটি বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলায় গড়ে উঠলেও অচিরেই ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একটি ধারা হিসেবে সমগ্র ভারতে। তা ছাড়া এ আন্দোলন শুরুতে তরুণদের দেশপ্রেম, ঔপনিবেশিক শক্তিবিরোধী শান্ড়িপূর্ণ নিষ্ঠা ও আদর্শ নিয়ে শুরু হলেও ক্রমে তা থেকে চরম ও সশস্ত্র ধারার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্ম নেয়। উভয় ধারাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। ফলে ব্রিটিশ শক্তি শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ বাতিল করতে বাধ্য হয়।

### স্বদেশী আন্দোলনের শিক্ষামূলক ধারা

১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলন সরকারের দমন-নিপীড়নের ফলে নতুন মোড় নেয়। স্বাদেশিকতার জোয়ার স্কুল, কলেজ ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সৃষ্টি হলে সরকার ব্যাপকভাবে দমন নিপীড়নের পন্থা অবলম্বন করে। প্রচুর ছাত্রকে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ সব ছাত্রের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করার জন্য ১৯০৬ সালের ১১ মার্চ শিক্ষা পরিষদ গঠন করা হয়। অবশ্য ১৯০২ সালেই বাংলায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যুবকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ গড়ে তোলার জন্য ডন-সোসাইটি গড়ে তোলেন। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়সহ অনেকে এগিয়ে আসেন স্কুল-কলেজ থেকে সরকার কর্তৃক বহিস্কৃত ছাত্রদের লেখাপড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। গঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ এন্ড স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনেকেই নিজস্ব অর্থব্যয়ে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার পথ উন্মুক্ত করে দেন। জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে যুক্ত হয়ে অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালে বিএম কলেজ স্থাপন করেন। রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহেও অনুরূপ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্বার্থে ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। কারিগরি শিক্ষাকে সকল ছাত্রের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। একই সঙ্গে উচ্চতর গবেষণার জন্য ফারসি ও জার্মান ভাষা শেখার ব্যবস্থা রাখা হয়। মূলত বেশী ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানোই এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল। ১৯১০ সালের পর জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন নানা কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। মূলত- (১) স্বদেশী আন্দোলন রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করায় ছাত্ররা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, (২) এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারি চাকরির সুযোগ না থাকায় ছাত্ররা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং (৩) জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোনো শিক্ষা তহবিল না থাকায় প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ সব কারণে স্বদেশী আন্দোলনের শিক্ষার ধারা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

### স্বদেশী আন্দোলন ও স্বদেশী পণ্য

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিলেতি পণ্য সম্ভার 'বয়কট' বা বর্জন করার স্লোগান দিয়ে। এই আন্দোন ১৯০৬-০৭ সালে এতোখানিই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, বাংলায় তখন বিলেতি পণ্যসামগ্রী বাজারে তেমন কেউ কিনতে চাইতো না। এর ফলে বাজারে দেশীয় কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, লবণ শিল্প, চিনি-গুড় শিল্প, চামড়া শিল্প ইত্যাদি দ্রুত প্রসারের সুযোগ পায়। স্বদেশী যুগের সুযোগে টাটা, 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানেরও প্রসার ঘটে।

### স্বদেশী আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক সংগঠন

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মতো সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তি ও সংগঠনও যুক্ত হয়। এদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি মুকুন্দ দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারাকে তাদের গান ও রচনাবলিতে এমনভাবে উপস্থাপন করেছিলেন যা মানুষকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করতো। এই আন্দোলনের প্রভাবেই গড়ে উঠেলিছ চট্টগ্রামে, 'চট্টল হিতসাধিনী সভা', ময়মনসিংহে 'সাধনা', বরিশালে 'স্বদেশ বান্ধব', ঢাকায় 'অনুশীলন', ফরিদপুর 'ব্রতী' ইত্যাদি সংগঠন।

### স্বদেশী আন্দোলন : বৈপ্লবিক পন্থা

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যতবেশি দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে ততবেশি স্বদেশী আন্দোলনে চরম পন্থায় সরকার উৎখাত, দেশ স্বাধীন করার চিন্তা প্রবল হতে থাকে। এই ধারা থেকে জাতীয় কংগ্রেসও মুক্ত থাকতে পারেনি। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ভারতবাসীর আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে 'স্বরাজ' আদায়ের ধারা প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়ে উঠে তাদের একটি অংশ। ১৯০৭ সালে সুরাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের আদর্শগত বিরোধ এভাবে প্রকাশ পায়। চরম পন্থীরা 'বয়কট' ও স্বদেশী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং চরমপন্থীরা অধিবেশন ছেড়ে চলে যায়।

বিংশ শতাব্দীর কিছুটা আগে থেকেই ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে কিছু কিছু গোপন বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে এ সব সংগঠন সশস্ত্র পন্থায় ব্রিটিশদের উৎখাতের মাধ্যমে স্বাধীনতার কথা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা শুরু করে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে 'অনুশীলন সমিতির' তরুণরা ব্যায়াম চর্চা, মুষ্টিযুদ্ধ ও লাঠি চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এই সংগঠনটি কলকাতায় মদন চিত্র লেনে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনে অনুশীলন সমিতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'অনুশীলন সমিতির' প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পুলিন বিহারী দাস। উভয় অনুশীলন সমিতিই ব্রিটিশ শাসনের অবসানকল্পে সশস্ত্র পন্থায় সরকার উৎখাতের ধারণা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ১৯০৬ সালে যুগান্ড়র পত্রিকার দুই সহকর্মী অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্যোগে গঠিত হয় 'যুগান্তর গোষ্ঠী।' এরাও একই পন্থায় ব্রিটিশ সরকারের অবসান চাইত। এরা পূর্ববঙ্গের অত্যাচারী লেফটেনেন্ট গভর্নর ফুলার বামফিল্ডকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়ে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য প্রফুল- চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯০৮ সালে এই হত্যাকান্ড সম্পন্ন করতে গিয়ে তারা যে গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন তাতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, অন্য এক ইংরেজের স্ত্রী-কন্যা তাতে মৃত্যুবরণ করেন। এই বোমা হামলায় নিজেকে ধরা না দিয়ে প্রফুল- চাকী আত্মহত্যা করেন, ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। তাদের দু'জনের আত্মত্যাগের আদর্শ মানুষের কাছে আজও দেশ স্বাধীন করার মহৎ প্রেরণা হিসেবে উচ্চারিত হচ্ছে। তবে সশস্ত্র বিপ্লবের আন্দোলনের এ ধারা বিভিন্ন উপধারায় বিভক্ত হয়ে ত্রিশের দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অনেকেই বিপ- ববাদী পথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিষয়টিকে পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির স্বাভাবিক রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে পরিচালিত করেন। তবে বিংশ শতকের শুরুতে স্বদেশী আন্দোলনে অসংখ্য তরুণ বিপ্লবীবাদী রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি দীক্ষা নিয়ে দেশকে বিদেশী শাসন মুক্ত করার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। তাদের দেশপ্রেম কোনো খাঁদ ছিলনা, তাদের রাজনৈতিক পথের সঙ্গে অনেকেই হয়তো একমত পোষণ করবেন না। কিন্তু তাদের বিপ্লববাদী আন্দোলনে ভীত হয়েই ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়, পরবর্তীকালে ভারত ছাড়ার পরিকল্পনা ঘোষণা দেয়। এখানেই এই আন্দোলনের সাফল্য নিহিত ছিল।

## মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ নতুনভাবে সূত্রপাত হয়। লর্ড কার্জনসহ ব্রিটিশ সরকার বেশ পূর্ব থেকেই পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন পেতে উদগ্রীব ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যসমূহ দূর করার কোনো উদ্যোগ না নিয়ে বরং ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করার, মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠা পাওয়ার একমাত্র উপায় বলে প্রচার করে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের প্রতি বাঙালি অগ্রসর মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইতিবাচক এবং সমর্থন দেওয়ার। অথচ এক সময় মুসলমানরা ব্রিটিশদেরকে সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করতো, ইংরেজি ভাষা চর্চায় বাঙালি মুসলমানদের এগিয়ে না আসার অন্যতম কারণই ছিল ইংরেজদের প্রতি সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান গ্রহণ। কিন্তু সরকারি চাকরিসহ বিভিন্ন অভিজাত পেশায় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া, কংগ্রেসের মতো দলেও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা মুসলিম জমিদার, নবাব শ্রেণীকে বিকল্প সন্ধানে আগ্রহী করে তোলে। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণাতে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে অধিকতর লাভবান হওয়ার বিবেচনাকে বঙ্গভঙ্গে সমর্থন দেওয়ার অন্যতম কারণ বলে ধারণা করা হয়। ১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ দিবস উপলক্ষে যে সব সভাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় তাতে পূর্বের বছর থেকে মুসলমানদের উপস্থিতি ছিল অনেক বেশি। এ অবস্থায় মুসলমানদের সংগঠিত করে ব্রিটিশদের কাছ থেকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা আদায় করে বাঙালি মুসলমানদের এগিয়ে নেওয়ার চিন্তাভাবনা দ্রুত প্রসারিত হয়। এই প্রক্রিয়া থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের বিপরীতে মুসলিম লীগ নামে একটি নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

ঢাকায় ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাৎসরিক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ঢাকার শিক্ষা সম্মেলন শেষে কয়েকজন সদস্য ২০ ডিসেম্বর তারিখে সিমলা প্রতিনিধি দলের কয়েকজন সদস্যসহ একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকে বসে ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থসমূহ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে একটি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ড় ঘোষণা করেন। শিক্ষা সম্মেলনের পর ৩০ ডিসেম্বর নওয়াব ভিকারুল মুলুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে নওয়াব সলিমুল্লাহ রাজনৈতিক দল হিসেবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের একটি প্রস্ড়াব উত্থাপন করেন। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নে ৩টি কারণ উল্লেখ করা হয়।

১. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং কোনো সরকারি নীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুসলমানদের ভুল ধারণার অবসান করা;
২. ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা, উন্নয়ন সাধন এবং তাদের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্খার কথা সরকারের নিকট সসম্মানে পেশ করা;
৩. মুসলমানদের মধ্যে যাতে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বৈরী মনোভাব জাগ্রত না হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অবশ্য এই নীতির সঙ্গে লীগের অন্যান্য লক্ষ্যসমূহের যাতে কোনো সংঘাত না হয় সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

উক্ত সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানিয়েও প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে নিন্দা জানানো হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে নিরুৎসাহিত করার জন্যও সম্মেলন থেকে সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়।

এরপর মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে করাচী (প্রথম পর্ব), ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে আলীগড়ে অনুষ্ঠিত হয়। আলীগড় অধিবেশনে আগা খানকে মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়। তিনি উক্ত পদে

১৯১৩ সাল পর্যন্ড় দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠায় যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তাদের মধ্যে নবাব সলিমুল-াহ, সৈয়দ নওয়াব আলী, নওয়াব মুহসিন উল মুলক, নওয়াব ভিখারুল মুলক, জাফর আলী খান প্রমুখ ছিলেন। ১৯০৮ সালের মধ্যে মুসলিম লীগের বিভিন্ন প্রদেশ শাখা গঠিত হয়। ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে মুসলমানদের মধ্যে হতাশা নেমে আসে। তবে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলিম লীগ এককভাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

### মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন-১৯০৯

বেশ কয়েক বছর থেকেই ভারতের মুসলমানগণ পৃথক নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করতে থাকে। ১৮৯২ সালের কাউন্সিল আইন সেই আকাঙ্খা পূরণ করতে পারেনি। বঙ্গভঙ্গের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে অসন্ড়োষ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সচিব মর্লি কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দেন। তখন ভারতের বড় লাট ছিলেন লর্ড মিন্টো। মর্লির প্রস্ড়াব মিন্টো সমর্থন করে ১৯০৯ সালে যে সংস্কার আইন গ্রহণ করেন তা মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন নামে পরিচিত। এই আইনের মূল বিষয় ছিল ঃ

১. বড় লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করা;
২. বাংলা প্রদেশে গভর্নরের একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা;
৩. ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের ফলে ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা গঠন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা ১৬ থেকে ৬০ জনে বৃদ্ধি করা হয়। এই ৬০ জনের মধ্যে ২৮ জনের বেশি সরকার মনোনয়ন দিতে পারবে না বলে নিয়ম করা হয়। এই আইনে মুসলমানদের আলাদা প্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকার করা হয়। এর ফলে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে স্বস্ড়ি কিছুটা ফিরে আসে। তবে সম্প্রদায় ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবির স্বীকৃতি পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দূরত্ব দ্রুতই যেন বৃদ্ধি পেতে অবদান রাখে।

### বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১)

ব্রিটিশ রাজশক্তি আশা করেছিল যে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা তারা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে, কিন্তু সময় যত অতিক্রান্ত হয় পরিস্থিতি ততজটিল আকার ধারণ করে। ইংরেজ সরকারের ধারণা ছিল যে, বাংলার মুসলিম সমাজ এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত না হলে এককভাবে হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দীর্ঘদিন দরে রাখতে পারবেনা। বাস্তবে পরিস্থিতি কিন্তু দ্রুত সরকারের ধারণার বাইরে চলে যায়। স্বদেশী আন্দোলন শান্তিপূর্ণ এবং চরমভাবাপন্ন-এই দুই ধারাতেই জোরদার হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে তাদের রাজত্বের ভবিষ্যত নিয়েই শংকিত হয়ে পড়ে। ১৯১১ সালে এই প্রথম ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারত পরিদর্শনে আসেন। মুঘল প্রাসাদে ভারত সম্রাট হিসেবে তার অভিষেক সাড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠান থেকে ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ নিজেই বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা প্রদান করেন। তবে উক্ত ঘোষণা থেকে আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। একই সঙ্গে আন্দোলন বিক্ষুব্ধ কলকাতা থেকে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৫ সাল থেকে চালুকৃত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' বিলুপ্ত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চল নিয়ে গভর্নর শাসিত বাংলা প্রদেশ চালু হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের পর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে উত্তেজনা অনেকটা কমে আসে। বাঙালি মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গ রদে কিছুটা হতাশ হলেও মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে ভারতের স্বায়ত্বশাসন আদায়ের দাবি উত্থাপন করার ফলে পরিস্থিতিতে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ফলে উভয় দল ও সম্প্রদায়ের রাজনীতি এ ধারাতে কিছুদিন পরিচালিত হতে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.২

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ**

১. বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পেছনে প্রশাসনিক কারণ কি ছিল?
২. বঙ্গভঙ্গের প্রাথমিক প্রক্রিয়া কি ছিল?
৩. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় কি বলা হয়েছিল?
৪. বয়কট-আন্দোলনের বর্ণনা দিন।
৫. স্বদেশী আন্দোলনের শিক্ষামূলক ধারা কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।
২. স্বদেশী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৩. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দিন।
৪. বঙ্গভঙ্গ রদ ব্যাখ্যা করুন।

# পাঠ-৩: বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী রাজনীতি (১৯১১-১৯৩৬ খ্রি.)

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি-

- লক্ষ্ণৌ চুক্তির পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বর্ণনা করতে পারবেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সমাজের মধ্যে যেটুকু দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল বঙ্গভঙ্গ রদের পর এই সম্পর্কের আরো অবনতির আশংকাই প্রবল ছিল। কিন্তু কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উভয় সম্প্রদায় ও দলের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়। ফলে বঙ্গভঙ্গের রাজনীতিতে নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি, ভারতবর্ষের স্বয়ত্বশাসন আদায়, স্বরাজ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে রাজনীতি অগ্রসর হয়েছে। এই অধ্যায়ে সেই সব ঘটনা এবং উদ্যোগের কথাই আমরা এখন আলোচনা করবো।

## লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬)

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির ফলে ১৯১৬ সালে উভয় দলের মধ্যে লক্ষ্ণৌতে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ইতিহাসে তা লক্ষ্ণৌ চুক্তি নামে পরিচিত।

## চুক্তির পটভূমি

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) এবং তৎপরবর্তী বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার অভিজ্ঞতার ফলে কংগ্রেসের উদারবাদী অংশ জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য জাতীয় রাজনীতিতে ঐক্যসাধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কংগ্রেসে ঐ সময় উদরপন্থী নেতৃত্বের অবস্থান সংহত হয়, উগ্রপন্থীদের বেশির ভাগই কংগ্রেস ত্যাগ করেন। অপরদিকে ১৯১৩ সালে বোম্বাইয়ের প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একই সঙ্গে মুসলিম লীগেরও সদস্য পদ গ্রহণ করেন। তিনি অবশ্য কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন। সেই সময় কংগ্রেসের কোনো সদস্যের মুসলিম লীগের সদস্যপদ গ্রহণে বাধা ছিল না। জিন্নাহ তখন সংকীর্ণ দলীয় নয়, বরং জাতীয় স্বার্থে তার জীবন উৎসর্গকৃত হবে এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করেই লীগের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এর ফলে জিন্নাহকে তখন 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের দূত' বলে অভিহিত করা হতো। এর ফলে মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের জাতীয় রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে তেমন কোনো মৌলিক পার্থক্য থাকেনি। সকল ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এক্ষেত্রে ভারতের হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের কোনো বিকল্প থাকতে পারে না বলে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশ্বাস জন্মায়। মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতা লোকমান্য তিলকের অবদান ছিল বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। তিনি কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন (১৯১৬) এ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের সকল দায়িত্ব বহন করেন।

**লক্ষ্ণৌ চুক্তি ঃ** ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একটি যৌথ অধিবেশন লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে উভয় দলের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

(১) কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা স্বীকার করে নেয়, আবার মুসলিম লীগও কংগ্রেসের 'স্বরাজ' আদর্শ মেনে নেয়;

(২) প্রতিটি প্রাদেশিক পরিষদের মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হবে;

(৩) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হবে;

(৪) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যৌথভাবে ভারতীয় কাউন্সিলের বিলুপ্তি ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি সরকারের কাছে পেশ করবে।

এই চুক্তি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য গভীর তাৎপর্যবহনকারী ঘটনা ছিল। এ চুক্তির ফলে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিভেদ ঘুচিয়ে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে মঞ্চের নেপথ্যের শক্তি রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভক্তিকে উসকে দিয়ে ভারতের রাজনীতিকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মঙ্গলের স্বার্থে

পরিচালিত হতে দেয়নি। কিন্তু লক্ষ্মৌ চুক্তির চেতনায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ অবস্থান করলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

## ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন

১৯১৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত শাসনের বেশ কিছু বিধান পাশ করে। এটি ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে গৃহীত হয় বলে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন বলেও পরিচিত।

### পটভূমি

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইংল্যান্ড এই যুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের ভয়াবহতা এতই বেড়ে যায় যে ইংল্যান্ডকে বাধ্য হয়ে উপনিবেশের সাহায্য নিতে হয়। তখন ইংল্যান্ড ভারতীয়দের সহযোগিতা পাওয়ার বিনিময়ে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। যুদ্ধ শেষে ভারত সচিব অস্টিন চেম্বারলেন প্রশাসনে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের ভারতীয়দের দাবি মেনে নেওয়া উচিত বলে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে প্রস্তাব করেন। তাছাড়া ভারতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এর সঙ্গে চরমপন্থী আন্দোলনও যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে অন্যান্য উপনিবেশের মতো এখানে ভারতীয়দের শাসন করা সম্ভব হবে না বলেও তাদের ধারণা সৃষ্টি হয়। ১৯১৬ সালে বড়লাট চেমসফোর্ডও ভারতীয়দের সহযোগিতার পুরস্কার হিসেবে তাদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৯১৭ সালে চেমসফোর্ডের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য চেম্বারলেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তিনি পদচ্যুত হওয়ায় নবনিযুক্ত ভারত সচিব মন্টেগুকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি চেমসফোর্ড এবং বিশিষ্ট ভারতজনদের সঙ্গে আলোচনা করে ১৯১৮ সালে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। এটিকে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট' বলা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন পরিস্থিতির একটি চমৎকার বিশ্লেষণও রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি সংস্কার আইন পাস করে।

**আইনসমূহ ঃ** ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে যেসব আইন পাস করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে-

(১) কেন্দ্রে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়। এক, নিম্নকক্ষ, এর নাম এর হয় কেন্দ্রীয় আইন সভা (Central Legislative Assembly), দুই, উচ্চকক্ষ, এর নাম রাখা হয় রাজ্য সভা (Council of States)। উভয় কক্ষই নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। তবে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ও নির্ধারিত আসনে নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

(২) কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ১৪৫ জন নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে ১০৫ জন নির্বাচিত, বাকি ৪০ জন সদস্যকে মনোনীত করার বিধান করা হয়। তবে উক্ত ৪০ জনের মধ্যে সরকারি কর্মচারী ২৬ জনের বেশি হবে না।

(৩) রাজ্য সভার আসন সংখ্যা ৬০ জন নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে ৩৬ জন নির্বাচিত, ২৬ জন অনির্বাচিত সদস্য হবে। প্রাদেশিক আইন তথা রাজ্যসভাগুলো এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভায় পরিণত করা হয়।

(৪) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ আহ্বান, মুলতবী ঘোষণা ও ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা বড়লাটের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

(৫) কেন্দ্রীয় আইন সভা ও রাজ্য সভায় গৃহীত যে কোনো আইন বড়লাট বা প্রাদেশিক গভর্নর প্রয়োজনবোধ করলে বাতিল করে দিতে পারেন।

(৬) ভারত শাসন আইনে (১৯১৯) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও আয় সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করা হয়। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদে তিনজন ভারতীয়কে গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি, ডাক, রেল ও মুদ্রা রাখা হয়।

(৭) প্রাদেশিক সরকারের হাতে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, বিচার, সেচ, জেল, স্থানীয় শাসন, স্বাস্থ্য ন্যস্ত করা হয়।

### মূল্যায়ন

এই আইনের কিছু ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। এ আইন দ্বারা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্য পরিষদের কার্যকারিতা সর্বপ্রথম শুরু হয়। ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা রচিত হওয়ার ক্ষেত্রে এই আইনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের কর্মপরিধিও স্বীকৃত হয়।

তবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সেই পর্যায়ে ভারত শাসন সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ নেতিবাচক তথা সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। অমৃতসরে তখন অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে একে 'অসম্পূর্ণ ও হতাশাজনক' বলা হয়েছিল। কংগ্রেসের উদারপন্থীরা এটিকে স্বাগত জানায় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশোধনী আনার প্রস্তাব করে। অপরদিকে কট্টরপন্থী নেতৃবৃন্দ একে 'অপমানজনক' বলে অভিহিত করে। মুসলিম লীগের মধ্যেও দুধরনের প্রতিক্রিয়া

ছিল। মুসলিম লীগ প্রাদেশিক পরিষদে পঞ্চাশ শতাংশ সদস্য মুসলমানদের পক্ষে রাখার দাবি করে। তবে সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ ভারতে এই আইনের ইতিবাচক প্রভাব যথেষ্ট বলেই মেনে নিতে হয়। কেননা, ভারত শাসন আইন ১৯১৯-এর ওপর ভিত্তি করেই ১৯৩৫ সালের আইন রচিত হয়েছে, ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির পরও আইন প্রণয়নে পূর্ববর্তী আইনসমূহের গুরুত্ব বিশেষভাবে কাজে লেগেছিল।

## খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪)

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষাবলম্বন করার অপরাধে ইংল্যান্ডের নেতৃত্বে মিত্রশক্তি তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়ে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় তুরস্কের সুলতানকে 'খলিফা' বলে শ্রদ্ধা করতো। তুরস্কের খলিফার মর্যাদা রক্ষার জন্য ভারতে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয় তাকে খিলাফত আন্দোলন বলে। এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অহিংস পন্থায় আন্দোলনের যে কর্মসূচি প্রদান করে তা অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত। দুটি আন্দোলন একই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল বলে এক নামে একে 'খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন' বলা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন অবশ্য ১৯২৪ সালে কোনো প্রকার অর্জন ছাড়াই সমাপ্ত হয়ে যায়।

### পটভূমি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির অন্যতম দেশ হিসেবে যুদ্ধ করে। ভারতসহ অনেক দেশের জনগণ তখন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তবে তুরস্কের সুলতান জার্মানির পক্ষাবলম্বন করায় ভারতের মুসলমান সমাজ অস্বস্তিতে ছিলেন। যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় হলে মিত্রশক্তি জার্মানি-অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ও তুরস্ক জোটের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর ফলে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কেননা, ভারতের মুসলমানগণ তুরস্কের সুলতানকে ধর্মীয় খলিফা বলে শ্রদ্ধা করতেন। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তুরস্কের সুলতান এবং খিলাফতকে রক্ষা করাকে কেন্দ্র করে সূচিত হয় ১৯১৯ সালে যে আন্দোলন তাকে খিলাফত আন্দোলন বলা হয়।

### আন্দোলনের প্রস্তুতি

১৯১৮ সালে মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা ড. আনসারি তুরস্ককে সমগ্র আরব অঞ্চল ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। তাঁর দাবির প্রতি কংগ্রেস নেতা হাকিম আজমল খান সমর্থন জানান। ক্রমে বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ খিলাফতের বিষয়টিকে সমর্থন দান করে একটি আন্দোলনে রূপ দিতে থাকেন। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে (অমৃতসরের পূর্বদিকে অবস্থিত) এক সমাবেশে ব্রিটিশ বাহিনী গুলি চালিয়ে শত শত মানুষকে হত্যা করলে ভারতের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এই অবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি গান্ধীজীও সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৭ অক্টোবর (১৯১৯) খিলাফত দিবস উদযাপিত হয়। নভেম্বর মাসে দিল্লিতে সর্বভারতীয় খিলাফতের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং গান্ধীজীকে এর সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খিলাফত বিষয়ের সমাধান ইংরেজরা না করলে 'অসহযোগ' আন্দোলন ঘোষণা করা হবে। ১৯২০ সালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে অবস্থান করে।

**খিলাফত আন্দোলনের দাবিনামা ঃ** শুরু থেকেই খিলাফত আন্দোলন কয়েকটি দাবি উত্থাপন করে। দাবিসমূহ হচ্ছে–

(১) তুরস্কের খলিফার পদ ও তুরস্কের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ন রাখা যা 'জাজিরাত-উল আরব' নামে পরিচিত;

(২) মুসলমানদের ধর্মীয় পবিত্র স্থানসমূহ খলিফার অধীনে রাখা;

(৩) মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা রক্ষা করা।

### কর্মসূচি

প্রথম দিকে খিলাফত এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দাবি আদায়ে তৎপর ছিলেন। কংগ্রেস এবং খিলাফতের নেতৃবৃন্দ ১৯২০ সালের শুরুতে বড়লাট চেমসফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাত করে দাবিনামা উত্থাপন করলে বড়লট স্পষ্টভাষায় নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে দেন যে, জার্মানির পক্ষাবলম্বন করার অপরাধ থেকে তুরস্ককে কোনোভাবেই অব্যাহতি দেওয়া যাবে না। ১৯২০ সালের মে মাসে সেভার্স নামক চুক্তিতে তুরস্কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে ভারতের মুসলমানগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন এবং কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯২০ সালের জুন মাসে খিলাফত আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে–

(১) সরকারি খেতাব ও অবৈতনিক পদ বর্জন করা;

(২) পুলিশ ও সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করা;

(৩) বেসামরিক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া;

(৪) খাজনা বন্ধ করা;
(৫) সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সন্তানদের প্রত্যাহার করা;
(৬) বিদেশী পণ্য বর্জন করা।

### মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ কর্মসূচি

খিলাফত কমিটির অসহযোগ কর্মসূচির প্রতি মহাত্মা গান্ধী সমর্থন জানান। ১৯২০ সালে ১ আগস্ট অনশন ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে খিলাফত কমিটির আন্দোলনের কর্মসূচি শুরু হয়। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সভায় মহাত্মা গান্ধী অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্ড়াব পেশ করলে তা ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। নাগপুরের সম্মেলনে ঐ প্রস্ড়াব সমর্থন করা হয়। মহাত্মা গান্ধী হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে একটি বড় ধরনের অসহযোগের ডাক দেন। তিনি বলেন, "ব্রিটিশ জনগণ যদি ভারতীয়দের প্রতি ন্যায় বিচার না করে তাহলে প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা।" এই আন্দোলনের পথ ছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্রিটিশ রাজ্যের অবসান ঘটানো। এতে ধর্ম-বর্ণ-জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয় ঘটানোর চিন্তা ছিল। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ১৯২১-২২ সালে যুগ্মভাবে ভারতে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। হিন্দু-মুসলিম, নারী-পুরুষ, কৃষক-শ্রমিক, ধনী-দরিদ্রসহ সকলের মধ্যেই অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি তাদের চাকরি ত্যাগ করে বিকল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। আন্দোলনের তহবিল সংগ্রহের জন্য ভারতের নারীরা মুক্ত হস্তে সোনা-গয়না দান করেন।

### ব্রিটিশদের দমন-নিপীড়ন ও জনগণের প্রতিরোধ

আন্দোলন যত বেগবান হতে থাকে ব্রিটিশরা ততবেশি নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার, মামলা রুজু ও হয়রানি করতে থাকে। তারা সেপ্টেম্বর মাসে (১৯২১) মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে 'রাজদ্রোহিতা'র অভিযোগ তাদের গ্রেফতার করে। ক্রমে ক্রমে তারা গান্ধীজী ছাড়া প্রায় সব নেতাকেই জেলে পুরতে থাকে। বিভিন্ন দিকে এ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ বাড়তে থাকে। আন্দোলন আর শান্তিপূর্ণ রাখা যাচ্ছিলনা। ব্রিটিশ সরকার সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন, মামলা রুজু বৃদ্ধি করতে তাকে। আন্দোনে অংশ গ্রহণকারীরাও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। ১৯২২ সালের মার্চ মাসে উত্তর প্রদেশের গোরখপুরের চৌরিচৌরা গ্রামে উত্তেজিত জনতা থানায় আগুন লাগিয়ে ১২ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। আরও কিছু কিছু জায়গাতেও ভাংচুর, হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হিংসাত্মক রূপ নেওয়ায় মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের অবসান ঘটান।

### প্রতিক্রিয়া

মহাত্মা গান্ধীর হঠাৎ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণার পর কংগ্রেস ও খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এমনকি ঐ সময় গান্ধীকে ব্রিটিশরা জেলে নিয়ে গেলে নেতৃবৃন্দ কোনো প্রতিবাদ পর্যন্ত করেননি। সুভাষচন্দ্র বসু একে 'জাতীয় বিপর্যয়' বলে অভিহিত করেন। আন্দোলনের এমন পরিসমাপ্তি কংগ্রেস বা খিলাফতের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীসমর্থকদের কাম্য ছিল না। ফলে ভারতে কংগ্রেস ও লীগের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে।

### মূল্যায়ন

চৌরিচৌরার মর্মান্ড়িক ঘটনার পর মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক একতরফাভাবে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেওয়ার পক্ষে ও বিপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন একজন অহিংস সত্যনিষ্ঠ নেতা। এই আন্দোলন যত দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছিল ততবেশি এর অহিংস চরিত্র পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে তিনি অগণিত মানুষের প্রাণহানির আশংকা করছিলেন। ব্রিটিশ সরকার যেভাবে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মারমুখী হতে শুরু করে তাতে গ্রামের দরিদ্র, সাধারণ কৃষক, শ্রেণীপেশার মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। ফলে মানুষের মধ্যে আন্দোলনের ভবিষ্যত নিয়ে কোনো চূড়ান্ত আশাবাদ সৃষ্টি করা যায়নি, লক্ষও নির্ধারণ করা যায়নি। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজ্যের উৎখাত হবে তেমন নিশ্চয়তাও ছিল না। অধিকন্তু এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি খিলাফতের পক্ষে তুরস্কেরই কোনো আন্দোলন ছিল না, বরং খিলাফত ও সুলতানের বিরুদ্ধে তুরস্কেই বিদ্রোহ দেখা দেয়। ভারতের মুসলমানরা এতে হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন দীর্ঘ করার বাস্তবতা না দেখে গান্ধী তা বাতিল করে দেন।

বিপক্ষ মত হচ্ছে, আন্দোলন অব্যাহত থাকলে 'ঘুম ভারত যেভাবে জেগেছিল' তাতে বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন আশা করা যেত। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে সুদৃঢ় করে ব্রিটিশ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা যেত। আসলে এসবই অনুমানের কথা। রাজনীতিতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত কথা এভাবে বলা যায় না। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

বস্তুত চাকরি থেকে পদত্যাগ করার যেসব চূড়ান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ছিল, চাকরিজীবীদের রুটি-রুজির অনিশ্চয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঘোষিত কর্মসূচি দ্বারা এই আন্দোলন কতদিন ধরে রাখা যেত তা বলা মুশকিল।

মানুষের মধ্যে যে আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছিল তৎকালীন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতৃত্ব তাকে যথাযথভাবে দেশীয় রাজনীতির গতি প্রবাহ পরিবর্তনের চিন্তা থেকে ঢেলে সাজায়নি। ফলে তুরস্কের সুলতানের দেশ ত্যাগের পর (১৯২২, ১৭ নভেম্বর) তা এমনিতেই শেষ হয়ে যেত। ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্ক একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচয়ে আবির্ভূত হয়। ভারতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এর আগেই স্তিমিত হয়ে পড়ে।

তবে এই আন্দোলন ভারতে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, কুটির শিল্পের উৎপাদন, দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্বরাজ আন্দোলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

## বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ভারতকে মুক্ত করাই ছিল বিপ- বীদের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ব্রিটিশ সরকারের পতনে আস্থা রাখতে না পেরে বাংলার তরুণ সমাজ সশস্ত্র পন্থায় ব্রিটিশ রাজকে বিতাড়িত করার স্বপ্ন থেকেই বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করে ছিল। এই আন্দোলন বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ১৯০৬-১১ সাল পর্যন্ড় স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত ছিল। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রদ পরবর্তী প্রথম বিশ্ব যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। এই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে বাঘা যতীন নামে খ্যাত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে তিনি পরিচিত) এর নেতৃত্বে। ঐসব বিপ্লবী বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পকিল্পনা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যায়। সরকারি সেনাসদস্যদের সঙ্গে ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বাঘা যতীন শহীদ হন। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলা বিপ- বীদের সশস্ত্র আন্দোলন সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

তবে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিপ- বী আন্দোলন বন্ধ থাকলেও অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে বাংলায় বিপ্লববাদী আন্দোলনের পুনর্জাগরণ ঘটে। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মকান্ড অব্যাহত থাকে। এই আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি ছিল চট্টগ্রাম। ১৯২২ সালে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামে গোপনে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেন। ১৯২৩ সালে 'লাল বাংলা' নামে একটি প্রচারপত্র বিলি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীল পুলিশদের হত্যা করার কথাও বলা হয়। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে চট্টগ্রামে স্কুল শিক্ষক মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বাহিনী'। চট্টগ্রামে বিপ- বীরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরিকল্পনা করে। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সূর্য সেনের বাহিনী অস্ত্রাগর লুণ্ঠন করেন। বিপ্লবীদের অপর একটি বাহিনী চট্টগ্রামে টেলিগ্রাম অফিসে হামলা চালায়। এ সময় সূর্য সেনের নেতৃত্বে একটি বিপ- বী সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। চট্টগ্রামের অদূরে জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীরা অবস্থান গ্রহণ করেন। তবে ২২ এপ্রিল তারিখে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে বিপ- বীদের তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ তিন দিন চলে। যুদ্ধে অনেক বিপ- বী শহীদ হন। সূর্য সেনকে পরে গ্রেফতার ও ফাঁসি দেওয়া হয়। সূর্য সেন এবং তাঁর বিপ্লবী বাহিনীর সদস্যরা দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আত্মত্যাগের বিরল উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন।

ডবপ্লবী সূর্য সেনের আদর্শের সৈনিক প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাবে হামলা করে। প্রীতিলতা নিজে আত্মাহুতি (২৪ সেপ্টেম্বর) প্রদান করেন। অবশ্য ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে ঢাকায় পুলিশ ইনসপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে গুলি করে হত্যা করেন বিপ্লবী বিনয়কৃষ্ণ বসু। তিনি ঢাকার পুলিশ সুপার হাডসনকেও হত্যা করেন। বিপ- বীরা এ সময় পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। বিপ- বী বিনয়কৃষ্ণ বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত কলকাতায় ইনসপেক্টর জেনারেল সিম্পসন ও পুলিশ কর্মকর্তা ক্রেগকে হত্যা করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ড় সরকার সেনাবাহিনী তলব করতে বাধ্য হয়। এই তিন বিপ্লবী তরুণ কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং- সেনাবাহিনী-পুলিশের যৌথ শক্তির বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বিখ্যাত 'অলিন্দ যুদ্ধ' নামে এটি পরিচিত। তিন বিপ্লবী যুদ্ধে ধরা পড়েন। বাদল গুপ্ত বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। বিনয় বসু মারা যান এবং দীনেশ গুপ্তের মৃত্যুদন্ড হয়। বিপ্লবী যুগে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এই তিন যুবকের আত্মত্যাগ ছিল আর এক বিরল দৃষ্টান্ড়।

**সফল না হওয়ার কারণ ঃ** বিপ্লবী আন্দোলন চূড়ান্তভাবে সফল না হওয়ার কারণসমূহ হচ্ছে-

(১) গোপন সমিতিগুলো জনগণকে সম্পৃক্ত করার কথা ভাবেনি। তাদের ধারণা ছিল সশস্ত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই ভারত স্বাধীন করা সম্ভব হবে।

(২) গোপন সমিতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল না। তাদের মধ্যে আদর্শিক, কৌশলগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যও যথেষ্ট ছিল।

(৩) ডবপ্লবী গোপন সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠনে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ ছিল না।

(৪) ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত থাকার কারণে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে এদের ওপর দমন-নিপীড়ন বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল।

(৫) বিপ-বী সমিতিগুলোতে ক্রমেই মতভেদ বৃদ্ধি পায়। একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নেতাকর্মী কমিউনিজমের প্রতি আস্থাশীল হয়ে পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

### মূল্যায়ন

বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকের শুরুর কয়েকটি বছরকে বিপ্লবী যুগ, অগ্নি যুগ, যুব বিদ্রোহের যুগ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে তাকে। দেশের তরুণদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত অংশ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে সফল করার জন্য সশস্ত্র, বিপ্লবী পন্থায় ইংরেজ সরকারের উৎখাত করার জন্য দলেদলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের বিপ্লব চূড়ান্ড়ভাবে সফল হয়নি, দেশের স্বাধীনতা সশস্ত্র পন্থায় আসেনি। কিন্তু তাদের আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের ভিতকে দুর্বল করে দেয়, ভারতবর্ষে ইংরেজদের থাকা সম্ভব নয় এই ধারণাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলনে তরুণদের দেশপ্রেম, সাহস, আদর্শবাদিতা, আত্মত্যাগ জাতীয় ইতিহাসে অনুপ্রেরণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ড় হয়ে আছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা, বৃটিশ আন্দোলনে যারা আত্মহুতি দিয়েছিল সেই ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, সূর্যসেনদের কথাই স্মরণ করেছি।

## স্বরাজ্য দল ও বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২২-১৯২৬ খ্রি.)

### পটভূমি

১৯২২ সালে ভারতে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হওয়ার পর রাজনীতিতে হতাশা যেমন বেড়ে যায়, তেমনি নতুন দল গঠনের চিন্ড়াভাবনাও লক্ষ্য করা যায়। বিপ্লবী আন্দোলনের বিপরীতে নিয়মতান্ত্রিক ধারায় ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটানোর লক্ষ্য থেকে ১৯২২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ দল গঠনের উদ্যোগ চলে। গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরুসহ শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হলে মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার একটি বিকল্প ধারার কর্মসূচি শুরু করার চিন্ড়াভাবনা করেন। মতিলাল নেহরু সুভাষ চন্দ্র বসুসহ বেশ কয়েকজন তাতে সমর্থন জানান। আইনসভায় যাওয়ার পক্ষে-বিপক্ষে কংগ্রেসে দুটো গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। গান্ধীবাদী গোষ্ঠী দেশবন্ধুর পরিকল্পনা সমর্থন না করায় দেশবন্ধু কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন (১৯২২)।

**স্বরাজ দল গঠন ঃ** ১৯২৩ সালের ১ জানুয়ারি চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু 'স্বরাজ দল' নামক একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই দলের সভাপতি এবং মতিলাল নেহরু অন্যতম সচিব নির্বাচিত হন। কংগ্রেস থেকে অনেকেই স্বরাজ দলে যোগদান করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্বরাজ দল জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

স্বরাজ দলের কর্মসূচি ঃ স্বরাজ পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল, (১) আইনসভায় অংশগ্রহণ করে সরকারের কাজের সমালোচনা করা; (২) সরকারের বাজেটের সমালোচনার মাধ্যমে মন্ত্রীসভার পতন ঘটানো; (৩) জাতীয়তাবাদের অগ্রগতিতে সহায়তা দানের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিলের সমালোচনা করা; (৪) ইংরেজ শোষণ বন্ধ করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বায়ত্তশাসন অর্জন এবং মন্টেগু-চেমসফোর্ড (১৯১৯) আইনকে অকার্যকর করাই ছিল স্বরাজ পার্টির মূল লক্ষ্য।

**নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের সাফল্য ঃ** ভারতে ১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী ১৯২৩ সালে দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে স্বরাজ পাটি অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে। বিশেষত বাংলা, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও বোম্বাইতে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে। বাংলা প্রদেশে এই দল ৮৫টি আসনের মধ্যে ৪৭টি, এর মধ্যে ২১টিতে মুসলিমান প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বাংলায় নতুন এই দলের সাফল্যের পেছনে ছিল জনগণের কাছে দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাসের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বের দক্ষতা। নির্বাচনের পর স্বরাজ দল সরকারি অনুষ্ঠান বর্জন করে সরকারের নীতির প্রতি অসহযোগিতা প্রদান করে। কেন্দ্রীয় আইন সভায় এই দল ভারতের পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্ড়াব অনুমোদন করে। তবে ভারতের স্বাধীনতার পরিবর্তে দেশবন্ধুর ডোমিনিয়ন তত্ত্ব অনুগামীদের মধ্যে অসন্ড়োষ সৃষ্টি করে। ১৯২৫ সালের ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের হঠাৎ মৃত্যু হলে স্বরাজ দলের ভাঙ্গন শুরু হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির লক্ষে ১৯২৩ সালে একটি সমঝোতা করেছিলেন- ইতিহাসে এটি বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি নামে প্রসিদ্ধ।

### বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন প্রকৃত অর্থেই প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা, যিনি ধর্মীয় কারণে বাঙালির বিভক্তিকে কোনোভাবেই সমর্থন দিতে পারেননি। তিনি হিন্দু-মুসলিম মিলনে রচিত আন্দোলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তার নেতৃত্বে মুসলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটিকে ঐতিহাসিক বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি বলা হয়। এই চুক্তিতে মুসলমানদের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা প্রদান করা, বিশেষত

প্রশাসনিক পদে শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমানগণ পাবেন বলে উল্লেখ করা হয়। এই চুক্তি বলেই কলকাতা পৌর করপোরেশনের ডেপুটি মেয়র পদে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং স্বরাজ দলের সম্পাদক পদ হাজী আবদুর রশীদ খানকে প্রদান করা হয়।

তবে ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর এবং সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন শক্তির উত্থানে বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট হতে থাকে। ১৯২৬ সালে ঢাকা এবং কলকাতায় সংগঠিত দাঙ্গার পর এই চুক্তির অবসান ঘটে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস স্বরাজ দল গঠনের মাধ্যমে রাজনীতিতে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তা অব্যাহত থাকলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটার সুযোগ হয়তো ঘটতো।

### শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের চেষ্টা

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন (মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন) ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে অপ্রতুল ও হতাশাব্যঞ্জক ছিল। এর অধিকতর উন্নয়ন বা সংস্কারের দাবি ছিল। ১৯২৬ সালে স্বরাজ দলের নেতা মতিলাল নেহরু একটি জাতীয় দাবিনামা পেশ করেছিলেন। এরপর ইংরেজ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রশ্নে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য এসব উদ্যোগে দেখা যায়। নিম্নে সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উদ্যোগ ও দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হলোঃ

### সাইমন কমিশন (১৯২৭), নেহরু রিপোর্ট (১৯২৮) এবং জিন্নাহর ১৪ দফা (১৯২৯)

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে বড়লাট লর্ড আরউইন ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য বিশিষ্ট সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ স্যার জন সাইমনকে প্রধান করে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সদস্য হিসেবে ভারতের কারো নাম ছিল না। তাই কংগ্রেস, লীগ বা কোনো পক্ষই সাইমন কমিশনকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেনি। প্রবল বিরোধিতার মুখেই কমিশনের সদস্যরা ভারতে আসেন। কংগ্রেসের মধ্যেও ভারত শাসন সংস্কার নিয়ে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। তাছাড়া কেউ নিশ্চিত ছিলেন না যে ইংরেজ শাসকরা ভারতের জন্য কোনো শাসনতন্ত্র দেবে কিনা। তারপরও মতিলাল নেহরুকে প্রধান করে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে নেহরু রিপোর্ট উত্থাপিত হলে জহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগও মতিলাল নেহরুর রিপোর্ট গ্রহণ করেনি। নেহরুর রিপোর্টে বলা হয়- (১) সর্বত্র যৌথ নির্বাচন প্রথা চালু থাকবে, (২) যে সব প্রদেশে সংখ্যালঘু থাকবে তাতে এবং কেন্দ্রে মুসলমানদের আসন সংরক্ষিত থাকবে, (৩) সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে আলাদা করে একটি আলাদা প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া, তবে তা হবে ভারত ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভের পর, (৪) রাজনৈতিক ক্ষমতা এককেন্দ্রিক হবে।

নেহরু রিপোর্ট মুসলিম লীগ গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯২৯ সালের ২৮ মার্চ মুসলিম লীগের দিল্লি অধিবেশনে মুসলিম লীগের প্রধান জিন্নাহ চৌদ্দ দফা প্রস্তাব করেন। কংগ্রেস এই দফা সমর্থন দেয়নি। ফলে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আরো বেড়ে যায়। বস্তুত ভারতবর্ষের ভবিষ্যত সাংবিধানিক কাঠামো নিয়ে ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ছাড়াও ছোট ছোট রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো মিল লক্ষ করা যায়নি।

তবে ভারতবর্ষের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সালের ২২ নভেম্বর থেকে ১৯৩১ সালের ১৯ জানুয়ারি প্রথম বৈঠক, ১৯৩১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ১৯৩১ পর্যন্ত দ্বিতীয় বৈঠক এবং ১৭ নভেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তৃতীয় ও শেষ গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনে। কিন্তু বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা, ফেডারেশন গঠন, ডোমিনিয়ন বা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ইত্যাদি বিভিন্ন জটিল প্রশ্নে ভারতীয়রা কেউই মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেনি, দূরদৃষ্টিও দেখাতে পারেনি। ফলে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রশ্নে সকল বৈঠক, উদ্যোগ, আন্দোলন, দাবিনামা ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। এরপর ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে স্বীয় চিন্তাধারা মোতাবেক ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়।

### ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ভারত শাসন, ১৯৩৫' নামে একটি সাংবিধানিক আইন পাস করে। একই সালের ৪ এপ্রিল রাজা তাতে সম্মতি জ্ঞাপনের পর ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে এই আইন কার্যকর হয়। এটিকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বলা হয়। ব্রিটিশ ভারত শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাসের শেষ সময়ে প্রণীত এই আইনটি শুধু ব্রিটিশদের ভারত শাসনের ক্ষেত্রেই নয় বরং ভারত পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরও দেশ শাসনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছিল।

### পটভূমি

১৯৩১ সালে গোলটেবিল আলোচনা ব্যর্থ হলেও ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে উক্ত গোলটেবিল আলোচনার কার্যবিবরণীর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ব্রিটেনের সংসদ উক্ত শ্বেতপত্র অনুমোদন করে। একই সঙ্গে পার্লামেন্ট সংসদীয় কমিটিকে একটি সুপারিশ নামা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করে। ১৯৩৪ সালে উক্ত কমিটি যে রিপোর্ট প্রদান করে তা ১৯৩৫ সালে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট ভারত শাসন আইন নামে পাস হয়।

## আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে- (১) ব্রিটিশ ভারতের ১১টি প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা, (২) প্রদেশ বা রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (Federal Government) গঠন করা। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে কার্যকর করার জন্য তিনটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (১) বার্মা এবং এডেনকে ভারত থেকে পৃথক করা হয়। একই সঙ্গে সিন্ধুকে বোম্বাই, এবং উড়িষ্যাকে বিহার থেকে আলাদা করে গভর্নর-শাসিত প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হয়, (২) ভারতীয় রাজ্যসমূহের ওপর ভারত সরকারের পরিবর্তে একজন রাজপ্রতিনিধির ওপর ন্যস্ত করা হয়; ভারতে ব্রিটিশ ভাইসরয় উক্ত রাজপ্রতিনিধির দায়িত্ব পালনে কোনো বাধা থাকবেনা, (৩) সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হয়।

১৯৩৫ সালের আইনে ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারাসমূহ হচ্ছে, (১) কেন্দ্রীয় আইনসভা হবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট- (ক) উচ্চ কক্ষ- কাউন্সিল অব স্টেট- সদস্য সংখ্যা ব্রিটিশ ভারতের ১৫৬ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ থেকে অনুর্ধ্ব ১০৪ জনসহ মোট ২৬০ জন (১৫৬+১০৪=২৬০ জন)। (২) নিম্ন কক্ষে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি ২৬০ জন, রাজ্যসমূহের ১২৫ জনসহ মোট ৩৮৫ জন।

আইন সভার ভারত শাসন আইনের দ্বারা সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হবে না বলে বিধান রাখা হয়। গভর্নরকে অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকর করা যায়নি। তারা গণতন্ত্রের চেতনাকে অনুধাবন করতে চায়নি।

## সমালোচনা

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয় সংগঠনই ১৯৩৫ সালের আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কংগ্রেসের 'পূর্ণ-স্বরাজ' বাস্তবায়িত হয়নি অভিযোগ করে কংগ্রেস এর বিরোধিতা করে। মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই আইনকে 'দানবিক ব্যবস্থা' বলে আখ্যায়িত করেন। আইনের ফেডারেল অংশ কার্যকর হলে কেন্দ্রে হিন্দুদের আধিপত্য বৃদ্ধি পাবে বলে লীগের বিরোধিতার মূল কারণ ছিল।

## নতুন আইনে নির্বাচন

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়। এই আইনের আওতায় ঐ বছর অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচন প্রথম ভারতীয়দের মধ্যে সীমিত গণতন্ত্রের সম্ভাবনার দ্বারা উন্মুক্ত করে দেয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৩

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ**

১. লক্ষ্ণৌ চুক্তির মূলধারা কী?
২. খিলাফত আন্দোলন কেন হয়েছিল?
৩. অসহযোগ আন্দোলন কেন হয়েছিল?
৪. স্বরাজ দলের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লিখ?
৫. খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হল কেন?
৬. সাইমন কমিশন কি?

**রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. লক্ষ্ণৌ চুক্তির প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বর্ণনা দিন।
২. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বর্ণনা দিন।
৩. খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. স্বরাজ দলের উদ্ভাব ও এর কর্মসূচী আলোচনা করুন।
৫. সাইমন কমিশন, নেহেরু রিপোর্ট ও জিন্নাহর চৌদ্দ দফা নিয়ে আলোচনা করুন।
৬. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

# পাঠ-৪ : বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি (১৯৩৭-১৯৪৭)

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষকপ্রজা পাটির আদর্শ ও কর্মকান্ড বর্ণনা করতে পারবেন।
- লাহোর প্রস্তাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ক্যাবিনেট মিশন বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনও উপমহাদেশ বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভারত সরকার আইন কার্যকর হওয়ার (১৯৩৭) পর থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসন আর মাত্র ১০ বছর টিকে ছিল। এই সময় বাংলা প্রদেশের শাসন, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মুসলিম সমাজের উত্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অপরদিকে এই সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনও বাংলাতেই জোরদার হয়ে উঠে যার পরিণামে ১৯৪৭ সালে দেশবিভক্তি সম্ভব ও সম্পন্ন হয়।

## কৃষক-প্রজা পার্টি (১৯৩৬)

১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে 'কৃষক-প্রজা পার্টি'র জন্ম হয়। তবে আগে এর নাম ছিল 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' যা গঠিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে। দলে রূপান্তরিত হওয়ার আগে এবং পরেও সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক। কৃষক-প্রজা পার্টি গঠিত হওয়ার পর বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন, দাবি-দাওয়ার বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফজলুল হক ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার পর রাজনীতিতে সক্রিয় জীবন শুরু করলেও তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান গ্রামের কৃষকদের স্বার্থের প্রতিই বিশেষভাবে নিবেদিত ছিল। বিভিন্ন জেলায় প্রজা আন্দোলন গড়ে তোলার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ সালে বরিশালে মুসলমান ও নমশূদ্র কৃষক-প্রজাদের তিনি সংঘবদ্ধ করেন। ১৯২১ সালে তাঁর অনুপ্রেরণায় গৌর নদীর আগৈলঝারায় এক প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমান্বয়ে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলা-মহকুমায় প্রজা আন্দোলন গড়ে উঠে। তিনি এগুলোতে ভাষণ দিতেন। তার ভাষণে দরিদ্র কৃষক প্রজারা শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তির দিশা পেত। ১৯২৬ সালে মানিকগঞ্জ মহমুকায় এ ধরনের এক সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে স্থানীয় জমিদারদের বিরোধও বাঁধে। এটি ছিল বঙ্গ তথা ভারতে নানা রাজনৈতিক ঝঞ্জাবিক্ষুদ্ধ সময়। ফজলুল হক কৃষক-প্রজাদের বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যোগদান করে একটি সংগঠন গড়ে তোলার কথা উপলব্ধি করেন। ১৯২৯ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় 'নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই এর সভাপতি নিযুক্ত হন। সক্রিয়ভাবে মুসলিম লীগ রাজনীতির নেতৃত্ব পর্যায়ে কাজ করলেও ফজলুল হক প্রজা সমিতির প্রয়োজনেই বেশি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মনে করতেন মুসলিম লীগের মাধ্যমে বাঙালিদের চাইতে অবাঙালিদেরই স্বার্থ বেশি প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই তিনি বাংলা কেন্দ্রিক প্রজা সমিতিকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি কৃষক-প্রজা পার্টির ২২ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। এই ২২ দফা কর্মসূচি ছিল দরিদ্র কৃষকদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের দিক নির্দেশনা। ফলে মুসলিম লীগের সঙ্গে তার সমিতি এবং রূপান্তরিত প্রজা পার্টির মতবিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ কারণেই ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশে মুসলিম লীগের সঙ্গে কৃষক-প্রজা পার্টির কোনো নির্বাচনী আঁতাত সম্ভব হয়নি। ২৫০ আসন বিশিষ্ট বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলমানদের ১২১টি নির্ধারিত আসনে কৃষক-প্রজা পার্টি এককভাবে ৩৬টি লাভ করে। ফজলুল হক মুসলিম লীগের সকল চাপ ও কৌশলকে পরাভূত করতে সক্ষম হন এবং তার নেতৃত্বেই প্রজা-লীগ সরকার গঠিত হয়। ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজাপার্টি দু'বার মন্ত্রিসভা গঠন করে। ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা ১৯৩৭-১৯৪১ এবং দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা ১৯৪১-১৯৪৩ সাল পর্যন্ড় বহাল ছিল। তবে নির্বাচনে জয়লাভের পর মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে ফজলুল হকের সঙ্গে প্রজাপার্টির মতদ্বৈততা ঘটে। দলটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ফজলুল হক ১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ফজলুল হক 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ' এবং সাধারণ মানুষকে 'ডাল-ভাতের' প্রতিশ্রুতি প্রদান করে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এর কোনটিই রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারপরও কৃষক-প্রজা পার্টির ইশতেহার, দাবিনামা পরবর্তীকালে (১৯৫০) জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

## ১৯৩৭ সালের নির্বাচন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়। ফলে উক্ত আইন মোতাবেক ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা এই আইনে ছিল ২৫০টি। এর মধ্যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ১২১টি। মুসলিম আসনসূহে মুসলিম লীগ, নবগঠিত কৃসক-প্রজা পার্টি এবং স্বতন্ত্র

সদস্যরা প্রার্থী হন। কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আদর্শ ও শ্রেণী স্বার্থগত কারণেই বিরোধ তীব্র হতে থাকে। প্রজা পার্টি ২২ দফা নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এতে যেসব দাবিদাওয়া ছিল তার অন্যতম ছিল,

১। 'জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী জমিদারি প্রথা'র (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) অবসান ঘটানো;

২। কুটির শিল্পসহ অন্যান্য শিল্প গঠনে উৎসাহ দেওয়া;

৩। গ্রামের সাধারণ মানুষের সামাজিক, অর্থনেতিক ও শিক্ষার উন্নতি সাধন করা;

৪। 'ঋণে জর্জরিত কৃষকদের দুরবস্থা লাঘব' করা;

৫। 'মাতৃভাষার উন্নতি' করা;

৬। 'বেকার সমস্যা সমাধান' করা ইত্যাদি।

কৃষক-প্রজা পার্টিকে অনুকরণ করে মুসলিম লীগও একটি ইশতেহার প্রকাশ করে। এতে মুসলিম লীগও 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ড় বিলোপ' করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ১২১টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ৪০, প্রজা পার্টি ৩৮, সাধারণ আসনে কংগ্রেস ৬০টি, বাকি আসনসমূহ অন্যান্য ছোটখাটো দলসহ স্বতন্ত্র সদস্যরা লাভ করে। প্রজা পার্টি অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও এর নেতা ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা গ্রামাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। প্রজা পার্টির 'ডালভাত'-এর ব্যবস্থা এবং 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ' স্লোগান দুটি কৃষকদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। নির্বাচনের পর স্বতন্ত্র সদস্যদের ১৬ জন প্রজা পার্টিতে যোগদান করেন। এই নির্বাচনে ফজলুল হক মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এর ফলে সরকার গঠনে ফজলুল হকের আমন্ত্রণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে পড়ে।

### ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় সরকার গঠনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বাংলার গভর্নর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বাংলার কংগ্রেস সভাপতি শরৎ বসুকে সরকার গঠনের আহ্বান জানালেও কংগ্রেস তাতে সাড়া দেয়নি। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ ফজলুল হককে সমর্থন জানানোর ফলে ফজলুল হকের পক্ষে সরকার গঠনে কোনো বাধা ছিল না। গভর্নরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ফজলুল হক ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করতে সক্ষম হন। ফজলুল হকের (মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়) মন্ত্রিসভার অন্যান্যরা ছিলেন, খাজা নাজিমুদ্দিন (স্বরাষ্ট্র), নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ (কৃষি ও শিল্প), নবাব মোশাররফ হোসেন (বিচার ও আইন), নলিনী রঞ্জন সরকার (অর্থ), স্যার বি.পি সিংহ রায় (রাজস্ব), প্রসন্নদেব রাইকত (শুল্ক ও বন), মুকুন্দু বিহারী মল্লিক (সমবায়, ঋণ ও পল্লী দরিদ্র) এবং মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী (যোগাযোগ ও পূর্ত)।

মন্ত্রিসভা গঠনের অল্প কদিন পরেই ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এর ফলে তার গড়া প্রজা পার্টি নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। তাকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্বও দেওয়া হয়। সোহরাওয়ার্দী হন এর সাধারণ সম্পাদক। ফলে হক মন্ত্রিসভা বাংলায় মুসলিম লীগের সরকার বলে পরিচিত পায়। এই মন্ত্রিসভার কৃতিত্বের মধ্যে উলে- খযোগ্য হচ্ছে ঃ

১। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে ১৯৩৮ সালের ৫ নভেম্বর ফ্রান্সি ফ্লাউডের নেতৃত্বে দশ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সুপারিশ মোতাবেকই ১৯৫০ সালে 'পূর্ববাংলা প্রজাস্বত্ব অধিগ্রহণ আইন' পাস হয়।

২। বাংলার কৃষকদের ঋণভার লাঘবের জন্য ১৯৩৮ সালে 'ঋণসালিসী বোর্ড' গঠন করা হয়।

৩। ১৯৪০ সালে 'মহাজনী আইন' পাস করা হয়। এ আইনে সরকার সকল মহাজনের জন্য ট্রেড লাইসেন্স আবশ্যকীয় করে।

৪। চাকরির ক্ষেত্রে সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় চাকরি নিয়োগ বিধি বা সম্প্রদায়ভিত্তিক বণ্টন বিধি চালু করে। এ আইনে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের জন্য ৫০ শতাংশ করে চাকরি নির্ধারণ করা হয়।

৫। ১৯৪০ সালে দোকান-কর্মচারীদের সাপ্তাহিক একদিন ছুটির বিধান চালু করা হয়।

৬। স্কুল, কলেজ স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখে।

৭। বিপ্লববাদী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে অনেক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে বন্দি করে রাখা হয়। ফজলুল হক সরকার এদের বেশির ভাগকেই জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

৮। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ইংরেজরা 'হলওয়েল মনুমেন্ট' স্থাপন করেছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরামর্শে হক মন্ত্রিসভা তা অপসারণ করে।

ফজলুল হকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের বিভিন্ন প্রশ্নে বিরোধ বাড়তে থাকে। বিশেষত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের উপর জিন্নাহর দলীয় নিয়ন্ত্রণ ফজলুল হক 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ে' হস্ড়ক্ষেপ বলে মনে করেন। মুসলিম লীগ সদস্যরা ফজলুল হককে বেকায়দায় ফেলার জন্য ১৯৪১ সালের ১ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তাদের ধারণা ছিল এর ফলে তার

সরকারের পতন ঘটবে। তিনি তখন ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, কৃষক-প্রজা পার্টি (শামসুদ্দিন গ্রুপ) এবং নিজের অনুসারীদের নিয়ে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন ও এদের সমর্থনে নতুন সরকার গঠন করেন। এটিকে তার দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা বলা হয়ে থাকে।

### ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩)

ফজলুল হক মন্ত্রিসভার পতনের পর মুসলিম লীগের খাজা নাজিমুদ্দিনের গ্রুপ মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা চালায়। কিন্তু নবাব খাজা হাবিবুল-াহর নেতৃত্বে একটি গ্রুপ ফজলুল হককে সমর্থন জানায়। তা ছাড়া ফজলুল হকের গঠিত প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় ফজলুল হক ডিসেম্বর মাসেই নতুন মন্ত্রিসভা গঠনে সক্ষম হন। পাঁচমিশালী দল নিয়ে গঠিত ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় অন্য যারা যোগদান করেন তারা হলেন খাজা হাবিবুল্লাহ (মুসলিম লীগের একাংশ), খান বাহাদুর আবদুল করিম (স্বতন্ত্র), খান বাহাদুর হাশেম আলী খান (কৃষক-প্রজাপার্টি-হক), শামসুদ্দিন আহমদ (কৃ-প্র-পার্টি), শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (হিন্দু মহাসভা), সন্ড়োষ কুমার বসু ও প্রমথনাথ ব্যানার্জী (ফরওয়ার্ড ব্লক-কংগ্রেস) এবং উপেন্দ্রনাথ বর্মণ (তফসিলী হিন্দু)। লক্ষ করা গেছে যে, ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় বঙ্গীয় কংগ্রেস যোগদান করেনি। এই সরকারকে জিন্নাহ উপহাস করে বলেছিলেন, 'ভাইসরয়কে বড়দিনের উপহার দিলাম ফজলুল হককে, বাংলার গভর্নরকে নববর্ষের উপহার দিলাম ঢাকার নবাবকে'। মুসলিম লীগ বিরোধী দল গঠন করে।

বাংলায় ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা ৪৭৫ দিন ক্ষমতায় ছিল। এই মন্ত্রিসভার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর ফলে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের তীব্রতা হ্রাস পায়, রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়, কিন্তু যেহেতু ইতোমধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্ড়ান প্রতিষ্ঠার ধারণা প্রচারিত হয়, তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ফজলুল হকের উদ্যোগটি বেশ বিলম্বিত হয়ে যায়। উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্তরা মুসলিম লীগের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। মুসলিম লীগ ঐ সময় সর্বভারতীয় অঙ্গনে পাকিস্ড়ান আন্দোলনে, এবং বঙ্গীয় পরিষদে বিরোধী দলে অবস্থান করে ফজলুল হককে মোকাবিলা করতে থাকে। এছাড়া আমলারা তাদের স্বার্থ সংশি- ষ্ট কারণে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। বাংলার গভর্নর জন হার্বাটের সঙ্গেও তার বিরোধ চলছিল। আইনসভার অধিকাংশ সদস্য তার পক্ষ অবলম্বন করার পরও ফজলুল হককে ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এভাবেই বিদায় নিতে হলো বাংলার সবচাইতে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা ফজলুল হককে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার থেকে।

### লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০)

১৯৪০ সালের ২৪ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোরে অনুষ্ঠিত সপ্তবিংশতিতম অধিবেশনে গৃহীত মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে লাহোর প্রস্তাব নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয় এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হয়।

### পটভূমি

ভারতের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে কবি ইকবাল উত্থাপন করেছিলেন। এরপর ১৯৩৩ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের নিয়ে 'পাকিস্তান' নামে একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্ড়াব দেন। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। বিশেষ করে মুসলিম লীগের লক্ষ্মৌ অধিবেশন (১৯৩৭)-এর পর থেকে জিন্নাহ সক্রিয় হয়ে উঠেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কংগ্রেস-লীগ রাজনীতিতে ব্রিটিশদের নিয়ে বিভেদ বেড়ে যায়। চারদিকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, অত্যাচার নিপীড়নের অভিযোগ বাড়তে থাকে। বস্তুত ১৯৩৭ সাল থেকেই মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক পাকিস্তান দাবির পথ ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে।

**লাহোর প্রস্ড়াব ঃ** ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির দীর্ঘ ভাষণে জিন্নাহ 'দ্বিজাতিতত্ত্বে'র ধারণা উপস্থাপন করে বলেন 'ভারতের মুসলমানরা সংখ্যা লঘু নয়।..... যে কোনো জাতিতত্ত্বের সংজ্ঞায় মুসলমানরা একটি জাতি'। (The Musalmans are not a minority ..... Mussalmans are a nation according to any defination of a nation)। জিন্নাহর এই তত্ত্ব জাতিতত্ত্বের সংজ্ঞায় সঠিক নয়। ধর্ম পরিচয়ে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক। কিন্তু জাতিগত পাঞ্জাবি, পাঠান, বাঙালি, বিহারিসহ অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। কিন্তু বিষয়টি মি. জিন্নাহ ধর্মীয় পরিচয়ে যেভাবে উত্থাপন করেছেন তাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আবেদন প্রবল হওয়ায় সংখ্যালঘু মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তেমন কেউ গভীরভাবে ভেবে দেখতে চায়নি। ফলে সেভাবেই বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যাগুরুদের নিয়ে রাষ্ট্র গঠনের দিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাধারণ মুসলমানরা ধাবিত হলো।

২৩ তারিখের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যাসংক্রান্ত মুসলিম লীগের মূল মনোভাব প্রস্তাবাকারে উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, "প্রয়োজনবোধে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলোর সমন্বয় সাধন করে যেমন- ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের এলাকাগুলোকে একত্রিত করে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিণত করা হবে এবং এদের অঙ্গরাজ্যগুলোও স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে।' ২৪ মার্চ গৃহীত লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বা 'দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষের জীবনযাপন করেননি। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্ম-বর্ণের স্বার্থরক্ষাকারী কোনো দেশ গঠনে মি. জিন্নাহ বিকল্প কোনো পথের কথা চিন্তা করেননি। তিনি ১৯৩৯ সালে Western Democracy : Unsuited for India (পশ্চিমা গণতন্ত্র ঃ ভারতের জন্য অনুপুযুক্ত) লেখা প্রবন্ধে পশ্চিমা গণতন্ত্র ভারতে অচল ভারতবর্ষের কোনো ঐক্যবদ্ধরূপ ছিল না। সে কারণেই তিনি ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত খন্ড খন্ড রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেই দ্বিজাতির ধারণা দেন। ১৯৪৭ সালের ভারতবিভক্তির ক্ষেত্রে লাহোর প্রস্তাবের প্রভাব পড়লেও হুবহু তার ধারণার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

## ক্রিপস মিশন-১৯৪২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চরম অবস্থা ধারণ করার পর মিত্র পক্ষ ভারতের স্বয়ত্তশাসনের ব্যাপারে ব্রিটেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। কেননা, তাদের ধারণা যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা ব্যতীত জয় লাভ করা কঠিন হতে পারে। ভারতবর্ষের অভ্যন্ড়রেও শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্যার স্ট্র্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য এবং আইনজ্ঞ ছিলেন। ১৯৪২ সালের ২২ মার্চ তিনি ভারতে এসে পৌঁছেন। ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ২৯ মার্চ একটি খসড়া প্রস্তাব সাংবাদিক সম্মেলনে পেশ করেন। তবে ১১ এপ্রিল উক্ত প্রস্তাব আবার তিনি প্রত্যাহার করে লন্ডন ফিরে যান। ক্রিপস প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল ঃ

১। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের জন্য ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করা হবে এবং ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে।

২। ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংবিধান সভা গঠন করা হবে এবং তাদের নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হবে; কোন রাজ্য বা প্রদেশ সংবিধান গ্রহণে অসম্মত হলে সেক্ষেত্রে সেই প্রদেশ বা রাজ্য নিজেদের সংবিধান রচনা করবে।

৩। প্রাদেশিক আইনসভা সংবিধান সভার সদস্যদের নির্বাচন করবে।

৪। কার্যনির্বাহক কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বড় লাটের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।

৫। ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের হাতে থাকবে।

ক্রিপসের প্রস্তাব মুসলিম লীগ বা কংগ্রেস কোনো দলই গ্রহণ করেনি। কেননা, এই প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের কোনো অঙ্গীকার বা আভাস ছিল না। তাই ভারতের স্বাধীনতাকামী সকল পক্ষই কিপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হওয়ায় ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

## নাজিমউদ্দীন মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-১৯৪৫)

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সরকারের পদত্যাগের (১৯৪৩) পর ২৩ এপ্রিল (১৯৪৩) মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমউদ্দীন ১৩ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভায় ৩ জন বর্ণহিন্দু ও ৩ জন তফসিলী হিন্দু সদস্য যোগদান করলেও বঙ্গীয় কংগ্রেসের কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না। গভর্নরের সমর্থনে তার সরকার ৭০ সদস্যে উন্নীত হয়। ঐ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেশ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এর কিছুদিন পরই ভারতে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় উক্ত দুর্ভিক্ষে প্রায় ৩০ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। সরকার, আমলাসহ সকল গোষ্ঠীর ত্রুটির কারণে দুর্ভিক্ষে এতো মানুষের মৃত্যু হয়। দেশের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। মহাজন, ব্যবসায়ী মহল এই দুর্ভিক্ষে অধিক লাভ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সরকারের মন্ত্রী ও আমলাদের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতির অভিযোগ ব্যাপক ছিল। দলের মধ্যেও দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়। দেশের করুণ অবস্থার কারণে ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চের বাজেট অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের অনাস্থা ভোটে (১০৬-৯৭ ভোটে) নাজিমুদ্দীন সরকারের পতন ঘটে।

## ১৯৪৬ সালের নির্বাচন

নাজিমুদ্দিন সরকারের পতনের এক বছর পর ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বাংলাসহ ভারতের সকল প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫০ আসনবিশিষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগ ১২১টি আসনের মধ্যে ১১৪টি এককভাবে লাভ করে। মুসলিম লীগের আকস্মিক এই সাফল্যের পেছনে সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। ২ এপ্রিল বাংলার নতুন গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ সোহরাওয়ার্দীকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান।

সোহরাওয়ার্দী বঙ্গের পরিস্থিতি অনুধাবন করে সরকার গঠনে কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করতে চাইলেন। কিন্তু তার সেই ইচ্ছা মুসলিম লীগের একটি অংশের বিরোধিতার কারণে সফল হয়নি। অবশেষে ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল মুসলিম লীগের ৭ এবং তফসিলী হিন্দুদের একজন সদস্য নিয়ে তিনি সরকার গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভা মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় অধিক আগ্রহী ছিল। ১৫ মাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তের দ্বন্দ্বের কারণে সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে কোনো আইন রচনা করা যায়নি। ঐ সময় প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তেভাগা চাষীদের আন্দোলন জোরদার হলেও বঙ্গীয় আইন পরিষদ 'বেঙ্গল বর্গাদার কন্ট্রোল বিল' পাস করতে পারেনি। মূলত জোতদারদের বিরোধিতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। একইভাবে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির উদ্যোগ নেওয়া যায়নি। তবে এই সময় (আগস্ট-১৯৪৬) 'কলকাতা দাঙ্গা' সংঘটিত হলে সোহরাওয়ার্দী সরকারের ভাবমুর্তি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সোহরাওয়ার্দী শরৎ বসুর যৌথ উদ্যোগে যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।

### ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা-১৯৪৬

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ভারতীয় রাজনীতির বাস্ড়বতা উপলব্ধি করে মন্ত্রিসভার তিন সদস্যকে ভারতে পাঠাবার কথা ঘোষণা করেন। এরা হলেন ভারত সচিব প্যাথিক লরেন্স, স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রিপস এবং এভি আলেকজান্ডার। মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত বলে এটিকে ক্যাবিনেট মিশন (Cabinet Mission) বলা হয়। ১৯৪৬ সালের ২৪ মার্চ ক্যাবিনেট মিশন ভারত আসে। মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করেন। কিন্তু কোনো সার্বজনীন মীমাংসার সূত্র খুঁজে না পাওয়া সত্ত্বেও কমিশন ১৯ মে তারিখ একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করে। পরিকল্পনায় উলে- খ করা হয় ঃ

১। ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যসমূহ নিয়ে একটি ফেডারাল ইউনিয়ন গঠন করা হবে। তবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা বন্টন করা হবে।

২। তিন শ্রেণীভুক্ত প্রদেশ করা হবে, হিন্দু অধ্যুষিত, মুসলিম অধ্যুষিত এবং আসাম ও বাংলাকে নিয়ে যথাক্রমে ক, খ ও গ শ্রেণীভুক্ত প্রদেশ গঠিত হবে। এই তিন শ্রেণীভুক্ত প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভারতীয় সংবিধান রচনা করবেন।

৩। নতুন সংবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর যে কোনো প্রদেশ যেকোনো ভাগ থেকে বের হয়ে যেতে পারবে।

৪। নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার (Interim National Government) গঠন করা হবে।

ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা কংগ্রেস বা মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। উভয় সংগঠনই ক্ষুব্ধ হয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগের ডাকে বাংলায় Direct Action শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ৪ দিন ধরে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বীভৎস দাঙ্গা চলে। এতে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। ইতিহাসের এই নৃশংসতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতবর্ষকে অবধারিতভাবে দেশভাগের দিকে ধাবিত করে।

### শরৎ বসু-সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রস্তাব (১৯৪৭)

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটবে। এই ঘোষণা শোনার পর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ জনমনে বিভক্তি কাটানোর কোনো উদ্যোগ নিতে পারেনি। বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাদের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম অন্যতম ছিলেন। তাঁরা উভয়ে 'স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী 'বৃহত্তর বাংলা' রাষ্ট্রের ধারণা ব্যক্ত করেন। ২৯ এপ্রিল আর এক বিবৃতিতে আবুল হাশেম 'স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র' গঠনের পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। সোহরাওয়ার্দী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অখন্ড বাংলার ধারণা বাস্তবায়নে ব্রিটিশ সরকার এবং মি. জিন্নাহর সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার এবং মি. জিন্নাহ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছিলেন। মনে হয় মি. জিন্নাহ পাকিস্তানের শক্তিশালী মিত্র হিসেবে অখন্ড বাংলাকে দেখতে চেয়েছিলেন। এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে দ্বন্দ্ব, বিভক্তি, বিভ্রান্তি চলতে থাকে। এই অবস্থায় ১৯৪৭ সালের ২০ মে শরৎ বসুর কলকাতাস্থ বাড়িতে অখন্ড বাংলার সমর্থকদের এক বৈঠকে একটি চুক্তি করা হয়।

এই চুক্তিতে বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে, এতে নির্বাচন ব্যবস্থায় সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের অধিকার নিশ্চিত থাকবে, সরকার, সংসদ, সংবিধান চাকরিসহ সর্বত্র মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়। এই চুক্তির প্রতি মুসলিম লীগের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ২৮ মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দী-বসু চুক্তির বিরোধিতা করা হয়। কংগ্রেসও অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক সক্রিয়া কোনো ভূমিকা

রাখেননি, তিনি বাংলা-আসাম নিয়ে রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে ছিলেন। বস্তুত অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া আরো আগে নেওয়া হলে এর একটি রূপ সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হতো। কিন্তু ১৯৪৭ সালে যখন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তখন ভারত বিভক্তির প্রক্রিয়া এতো বেশি এগিয়ে যায় সঙ্গে বাংলার বিভক্তিও অনেকটা অনিবার্য হয়ে পড়ে। কংগ্রেস-লীগের অসহযোগিতার মুখে সোহরাওয়াদী-বসুর পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

### ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ও উপহাদেশ বিভাগ

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি ঘোষণা পর লর্ড মাউন্টব্যাটনকে ভারতে ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের আইন মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তিনি ২২ মার্চ থেকে এ বিষয়ে কাজ শুরু করেন। ভারত বিভাগের রূপরেখা প্রণয়ন করে ৩ জুলাই তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এটিকে ভারতের স্বাধীনতা আইন বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

**ভারতকে দুভাগে ভাগ করার তার পরিকল্পনা নিম্নরূপ :**

১। এই উপমহাদেশে দুটি ডোমিনিয়ন-ভারত প্রজাতন্ত্র ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবে;

২। ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান বাসিন্দার প্রেক্ষিতে পাঞ্জাবে ও বাংলাকে ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভাগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলোর পরিষদ সদস্যরা আলাদা ভোটের মাধ্যমে বির্ধারণ করবে;

৩। মুসলিম সংখ্যাগুরু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট অনুষ্ঠিত হবে;

৪। প্রাদেশিক আইনসভা ভোটের মাধ্যমে সিন্ধুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে;

৫। ডোমিনিয়ন দুটির যে কোনো একটি দেশীয় রাজ্যগুলোর যোগদানের ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজার এখতিয়ারভুক্ত থাকবে;

৬। সংবিধানসভা দুটি ডোমিনিয়নের একটি করে সংসদ নিয়ে গঠিত হবে। এগুলো দুটি দেশের ভবিষ্যৎ মর্যাদার প্রশ্ন বিবেচনা করবে।

১৮ জুলাই ভারত স্বাধীনতা আইনে বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করে পশ্চিম বাংলাকে ভারতের সঙ্গে এবং পূর্ববাংলাকে পাকিস্ড়নের অংশ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'মাউন্টব্যাটন পরিকল্পনা' ভারতের স্বাধীনতা আইন হিসেবে অনুমোদন দেয় এবং তা ১৫ আগস্ট আইনে পরিণত করা হয়।

এভাবেই উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান দুটি আলাদা রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.৪**

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ**

১. কৃষক প্রজা পাটি প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দাও।
২. লাহোর প্রস্তাব আলোচনা করা।
৩. ১৯৪৬ সালের নির্বাচন সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
৪. বসু-সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব কী ছিল?
৫. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের ধারা কী ছিল?

**রচনামূলক প্রশ্নঃ**

১. কৃষক প্রজা পাটির আদর্শ ও কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. ফজলুল হকের দুই মন্ত্রিসভার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন।
৩. লাহোর প্রস্তাবের বিবরণ দিন।
৪. ক্রিপস মিশন কী?
৫. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা কী?